AL-BALAGH 1438 | 2017 | ISSUE 4

পৌঁছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব

আল বালাগ

البلاغ

البلاغ
আল বালাগ

AL-BALAGH 1438 | 2017 | ISSUE 4
আল বালাগ
البلاغ
Titumir Media

সূচী

আবুল ফজলদের থেকে সাবধান

ভারতবর্ষে মুসলিমদের সুদীর্ঘ আটশত বছরের শাসনকালে পূর্ণ ইসলামি শাসননীতি অনুসৃত হয়েছে, এটা যেমন দাবী করা যাবে না; তেমনি এটা বলাও ধৃষ্টতা হবে যে, এ পুরো সময়টাই কলঙ্কময় অধ্যায়। যেখানে সুলতান মাহমুদ গজনবী, আহমদ শাহ আব্দালী, সুলতান মুজাফ্ফর হালীম, বাদশাহ আলমগীরের মতো ন্যায়পরায়ণ শাসকগণ অতিক্রম করেছেন। ইতিহাসের পাতায় যাঁদের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। অসহায় আত্মহুতির মাধ্যমে মুসলিম শাসনের যবনি-কার সাথে সাথে গোলামির শিকল মুসলিম সমাজ-সভ্যতাকে অক্টোপাসের ন্যায় আঁকড়ে ধরে। এ সময়ে ধূর্ত ইংরেজদের শাসননীতির অসারতা জনসম্মুখে দেওবন্দী আলেমগণই তুলে ধরেন। তারাই বুকের তাজা খুন ঢেলে আজাদি আন্দোলনের ভিতকে মজবুত করেন।

দেওবন্দ শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের নাম নয়; দেওবন্দ একটি আন্দোলনের নাম, ঈমানি আন্দোলন, ন্যায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। একটি আদর্শের নাম; যার লক্ষ্য স্পষ্ট করে গেছেন সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ, ইসমাঈল শহীদ রহ, হাফেজ যামেন শহীদগণ। যার লক্ষ্য স্পষ্ট করে গেছেন কাসেম নানুতুবী রহ, হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ, শায়খুল হিন্দ রহ ও হুসাইন আহমদ মাদানী রহ প্রমুখ মনীষীগণ।

দেওবন্দ ও দেওবন্দিয়ত নিয়ে আমরা যারা গর্বিত; আকাবিরে দেওবন্দের অনুসৃত পথে তারা কতটুকু পরিচালিত হচ্ছেন?, তা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে বৈ কি?

এরাই তো আমাদের আকাবির; যাদের তপ্তলহু শামেলীর প্রান্তরে ঝরে পড়তে দেখি। পলাশীর প্রান্তরে ঝরতে দেখি। ঝরতে দেখি, অম্রকাননে, মহিশুরে, নারিকেল বাড়িয়ায়! ইংরেজদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা; গোলামির জীবনকে তুড়ি মেরে, হাদীসের মসনদ ছেড়ে, তালীমের মারকাজ ছেড়ে শাহ আব্দুল আযীয রহ. এর জ্বালাময়ী জিহাদি আহ্বানে ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া সিংহপুরুষগণই আমাদের আকাবির।

দেওবন্দের উসূলে হাস্তেগানা বা মূলনীতি অষ্টতে এ কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, সরকার সংশি-লষ্টতা এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

সুতরাং দেওবন্দী চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহকদের অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপে পথ চলতে হবে। মাদারিসে কওমিয়্যার স্বতন্ত্রতা ক্ষুণ্ন হয়; এমন কিছু করা মানে আকাবিরদের রক্তের সাথে গাদ্দারি করা। এদের মিষ্টি হাসি আর লৌকিক ভক্তিতে বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। এরাই তো সেই লোক; যাদের হাত এখনো আমাদের রক্তে রঞ্জিত! তাগুতের চাণক্যনীতির সাথে একাত্মতা পোষণকারী আবুল ফজলদের চিনতে ভুল করলে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে!

আমরা আশাবাদী, জাতির রাহবারগণ আমাদের ভুল পথে নেবেন না!

-তিতুমীর মিডিয়া

আল কুরআনে
নিকৃষ্ট আলেমদের উপমা

আব্দুল্লাহ তাশফীন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ

"আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন, সে লোকের অবস্থা; যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান; ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।" -সূরা আরাফ: ১৭৫

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শন-সমূহের বদৌলতে; কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইল। সুতরাং তার অবস্থা হলো কুকুরের মতো; যদি তাকে তাড়া করো তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এ হলো সেসব লোকের উদাহরণ; যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শনসমূহকে। অতএব, আপনি বিবৃত করুন এসব কাহিনী; যাতে তারা চিন্তা করে।" -সূরা আরাফ: ১৭৬

উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কার ব্যাপারে আলোচনা করতে বলেছেন, এ ব্যাপারে না কুরআনে স্পষ্ট কিছু বিবৃত হয়েছে, না মারফূ সূত্রে কিছু বর্ণিত হয়েছে। তবে একাধিক সাহাবী থেকে ভিন্ন ভিন্ন মত এ ব্যাপারে বর্ণিত আছে। তবে অধিকাংশ মুফাস্সির তার নাম বালআম বিন বাউরা হওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সে হিসেবে কুরআনে বিবৃত ঘটনার সার সংক্ষেপ এরকম, নীলনদে ফেরাউন সহ কিবতী সম্প্রদায়ের সলিল সমাধির পর মূসা আ. বালআম বিন বাউরা নামক এক আলেমকে তার সম্প্রদায় জাব্বারীনদের কাছে পাঠান দাঈ হিসেবে।

সে নিজ এলাকায় গেলে সেখানের শাসক তাকে জায়গীর বানিয়ে দেয়; ফলে সে স্ব-দায়িত্ব ভুলে ভোগ-বিলাসে মজে থাকে। এদিকে মূসা আ. বনী ইসরাঈলদের নিয়ে আল্লাহর আদেশে জাব্বারীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে বের হোন। এ সংবাদ জাব্বারীনরা পাওয়ার পর বালআম বিন বাউরার কাছে ছুটে আসে। কারণ সে ইসমে আজম জানতো। সে ছিল মুস্তাজাবুদ-দাওয়া; যা দোআ করতো, আল্লাহ তা-ই পূরণ করতেন। তাই জাব্বারীনরা তার কাছে আবেদন জানায়, সে যেন মূসা আ. এর বিরুদ্ধে তাদের জন্যে দোআ করে। সে প্রথমে অস্বীকার করে।

পরে মোটা অংকের ঘুষ দিলে মিনমিনে না না করলেও পরে রাজি হয়। কিন্তু বিপত্তি দেখা দেয় যখন সে বনী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে দোআ শুরু করে। কারণ বনী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে কিছু বলতে গিয়ে উল্টো তাদের পক্ষে বলে ফেলে; আর জাব্বারীনদের পক্ষে বলতে গিয়ে বিপক্ষে বলে ফেলে। এহেন অবস্থা দেখে জাব্বারীনরা ভড়কে যায়! বলে, আপনি তো আমাদের সর্বনাশ করছেন! সে বলে, এর ব্যতিক্রম বলতে আমার যবান অপারগ। এরপর তার জিহ্বা মুখগহবর থেকে বেরিয়ে বুক পর্যন্ত নেমে আসে। এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত সে কুকুরের মতো নিকৃষ্ট জীবন কাটায়।

এতটুকুই আয়াতের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত ঘটনা। বাকি ঘটনার সাথে আয়াতের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকায় তার বর্ণনায় না গিয়ে আয়াতের মর্ম উদ্ধারের চেষ্টা করা যাক।

কুরআনের বর্ণনাভঙ্গিটাই এমন যে, এতে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা স্থানের আলোচনা প্রসঙ্গত আনা হয় শুধু। প্রকৃতপক্ষে এর হুকুম সার্বজনীন। তো এখানেও বালআম বিন বাউরা নাম্নী ব্যক্তির ঘটনা দ্বারা উদ্দেশ্য এ স্বভাবের লোকজন। উদ্দেশ্য যেন তারা এ থেকে শিক্ষা নিতে পারে। যাদের আল্লাহ ইলমের অমূল্য নেয়ামত দান করেছেন; তারা যদি এর হক্ব আদায় না করে, একে স্বার্থ হাসিলের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে; তাহলে তাদের জন্যেও এ লাঞ্ছনা আর দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে!

ইলম আল্লাহ তাআলার সিফাত। এর মর্যাদা অনেক। তাই যাকে এর কিছু দেয়া হয়েছে, নিঃসন্দেহে তাকে অফুরান্ত কল্যাণ দেয়া হয়েছে। এরপরও যদি সে এর যথেচ্ছা ব্যবহার করে; তাহলে তার পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে? বালআম বিন বাউরা'র ঘটনা থেকে এর স্পষ্ট ধারণা আমরা পাই।

বর্ণিত আছে, তার পাঠচক্রে ১২ হাজার কলমদানী থাকতো! তাহলে দোয়াত নিশ্চয় আরো বেশি হবে। এ থেকে আন্দাজ করুন, কতজন ছাত্র তার দরসে উপস্থিত হতো! কিন্তু সে এর মান রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। পার্থিব কিছু সুবিধার কাছে সে বিকিয়ে গেছে। রিপুর তাড়নার কাছে হার মেনেছে। পরিণামে, সবচেয়ে মর্যাদার আসন থেকে আল্লাহ তাকে আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলেছেন। কুকুরের জীবন সে যাপন করেছে।

নিকৃষ্ট তুলনার জন্যেই কুকুরের প্রসঙ্গ টানা হয়। হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'দান' করে ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তিকে তুলনা করেছেন ঐ কুকুরের সাথে; যে নিজ বমি পুনরায় গলাধঃকরণ করে। কুকুর একমাত্র প্রাণী, যে কিনা স্বাভাবিক অস্বাভাবিক সব সময় হাঁপায়! বালআমকে সে নিকৃষ্ট শাস্তিই দেয়া হয়েছে। এত হলো দুনিয়াবি শাস্তি পরকালের শাস্তি কত ভয়াবহ হবে; তা আল্লাহই জানেন।

পরিশিষ্ট: এ আলোচনা থেকে আমরা 'উলামায়ে সূ' তথা দরবারী আলেমদের পরিচয়ও জানতে পারি। বালআম যেমনি জাব্বারীনদের শাসকের সংস্পর্শে গিয়ে ফিতনায় পতিত হয়েছে, তেমনি যারা দ্বীন বিরোধী শাসকদের কাছে যাবে, তারাও ফিতনায় পতিত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে। তবে আল্লাহ যাদের রক্ষা করেন, তারাই এ থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহ আমাদের দ্বীনের পথে অবিচলতা দান করুন। সে দল থেকে হেফাজত করুন; যাদের কথা কুরআনে বিবৃত হয়েছে এভাবে,

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"যাদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার অনুসরণ করেনি; তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধার মতো, যে পুস্তক বহন করে। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট! আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।" -সূরা জুমুআ: ৫

আমার ইলম কি উম্মাহর উপকারে এসেছে?

- মুহাম্মাদ আনিসুর রহমান

الحمد لله الذى وحده والصلوة والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ.

উলামায়ে কেরামগণের মর্যাদা সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা আমরা প্রায়শঃ শুনে থাকি। বাস্তবিকই এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুবারক যবান থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর এটাই একজন আলেমের জন্যে বড় সার্টিফিকেট, তাঁরা হলেন নবীগণের ওয়ারিছ। সাধারণ মানুষের ওপর তাঁদের মর্যাদা কেমন? এ বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তুলনা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ، قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ»

“আবু উমামা বাহেলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এমন দু'জন লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো, যাদের একজন হলেন আবেদ আর অপরজন আলেম। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– একজন আবেদের ওপর একজন আলেমের মর্যাদা ততখানি, তোমাদের সাধারণ কারো ওপর আমার মর্যাদা যতখানি।” -সুনানে তিরমিযী: ২৬৮৫।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

«مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ»

“যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্যে কোনো রাস্তা অতিক্রম করে, আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের রাস্তাসমূহের মধ্যে একটি রাস্তা অতিক্রম করান। আর ফেরেশতারা ইলম অন্বেষণকারীর জন্যে তাঁদের ডানা বিছিয়ে দেন এবং আলেমের জন্যে আসমান ও জমিনের সব কিছুই মাগফিরাত কামনা করে, এমনকি পানিতে বসবাসকারী মাছও তাঁদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আবেদের ওপর আলেমের ফযীলত এরূপ, যেরূপ পূর্ণিমার রাতে চাঁদের ফযীলত সমস্ত তারকারাজির ওপর। আর আলেমগণ হলেন নবীগণের ওয়ারিছ। নবীগণ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) মীরাছ হিসাবে রেখে যান না; বরং তাঁরা রেখে যান ইলম। কাজেই যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করল; সে প্রচুর সম্পদের মালিক হলো।” -সুনানে আবু দাউদ: ৩৬৪১।

উল্লিখিত হাদীস দু'টির আলোচনার মাধ্যমে আমরা ইলম অন্বেষণ, ইলম অন্বেষণকারী এবং আহলে ইলম তথা উলামায়ে কেরাম এর মর্যাদা-ফযীলত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেয়েছি; কিন্তু জানা জরুরী যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে কোন ধরনের ইলম লাভের দুআ করতেন; কেননা তিনি নিজেই এমন ইলম থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন, যা কোনো উপকারে আসে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করতেন,

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا»

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই এমন ইলম থেকে যা কোনো উপকারে আসে না, এমন অন্তর থেকে যা বিনয়ী হয় না, এমন নফস থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না, এমন দু'আ থেকে যা কবুল হয় না।” -সহীহ মুসলিম: ২৭২২।

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا»

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ইলমে নাফে', পবিত্র রিযিক ও মকবুল আমল চাই।” -সুনানে ইবনে মাজাহ: ৯২৫

اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْمًا

“হে আল্লাহ! যে ইলম তুমি আমাকে দান করেছ, তা দ্বারা আমাকে উপকৃত করো এবং যে ইলম আমার উপকারে আসবে, সে ইলম আমাকে দান করো এবং আমার ইলম বাড়িয়ে দাও।” -সুনানে তিরমিযী: ৩৫৯৯

সুতরাং যে ইলম কোনো উপকারে আসে না, উপরন্তু ক্ষতি পৌছায়; নিজের আখিরাতের পথকে সুগম তো করেই না, এমনকি উম্মাহর জন্যে আপদ ডেকে আনে, এমন ইলমে যরর থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে হবে। যে আলেমের ইলম দ্বীনের উপকারে আসে, মাজলুম উম্মাহর কল্যাণ বয়ে আনে, তাঁরাই হলেন উলামায়ে হক্ব। তাঁরাই নবীগণের ওয়ারিছ; তাঁদের জন্যেই আসমান ও জমিনের সব কিছু মাগফিরাত কামনা করে। পক্ষান্তরে যাদের ইলম দ্বীনের উপকারে আসে না, মাজলুম উম্মাহর কষ্ট আর আর্তনাদকে আরো বাড়িয়ে দেয়; এক কথায় ইসলামের দুশমনদের নাপাক আত্মাকে সন্তুষ্ট করে, এরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কিছু বিষয় রপ্ত করলেও ফযীলতলাভকারী আলেমের অন্তর্ভুক্ত নয়; এরা কিছুতেই নবীগণের ওয়ারিছ হতে পারে না। এদের ওপর আসমান ও জমিনের সব কিছু মাগফিরাত কামনা করবে তো দূরের কথা; বরং মহান রব, সকল ফেরেশতা এবং সমস্ত লা'নতকারী লা'নত করে।

এদের ব্যাপারেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ،

“আমি তো আমার উম্মতের ওপর ওইসব আইম্মার (অনুসৃত ব্যক্তিবর্গের) আশঙ্কা করি, যারা মানুষকে গোমরাহ করবে।” -সুনানে আবু দাউদ: ৪২৫২

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

يَقُولُ أَبَا ذَرٍّ كُنْتُ مُخَاصِرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى مَنْزِلِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ الدَّجَّالِ فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَدْخُلَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ أَخْوَفُ عَلَى أُمَّتِكَ مِنْ الدَّجَّالِ قَالَ الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ

“আবু যার রাযি. বলেছেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একদিন উপস্থিত ছিলাম এবং আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, এমন কিছু রয়েছে যেটির ব্যাপারে আমি আমার উম্মতের জন্যে দাজ্জালের চাইতেও অধিক ভয় করি। তখন আমি ভীত হয়ে পড়লাম; তাই আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটি কোন জিনিস, যার ব্যাপারে আপনি আপনার উম্মতের জন্যে দাজ্জালের চাইতেও অধিক ভয় করেন? তিনি বললেন, ওইসব আইম্মার (অনুসৃত ব্যক্তিবর্গের), যারা মানুষকে গোমরাহ করবে।” -মুসনাদে আহমাদ

আর এমন আশঙ্কায় পতিত পথভ্রষ্টকারী নামে মাত্র আলেমদেরকেই বলা হয় উলামায়ে ছু। আল্লাহ আমাদের তাদের ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। এবার আমরা সকলেই একটু চিন্তা করে দেখি, যাদেরকে আলেম শব্দে সম্বোধন করা হয়; আমাদের ইলম কি উম্মাহর উপকারে এসেছে? নাকি কাফের-মুশ-রিক, তাগুতদের মনোতুষ্টিতে ব্যয় হচ্ছে? তাহলে কীভাবে নিজেকে দাবী করবো নবীগণের ওয়ারিছ? আল্লাহ তাআলা আমাদের নিজেদের অবস্থান নিয়ে একটু ভাবার তাওফীক দিন– পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের কী সম্বোধন করবে– উলামায়ে হক্ব নাকি উলামায়ে ছু?

জিহাদ ফরজে আইন

শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.

আল্লাহর কসম!

জিহাদ যদি এখনো ফরজ না হয়ে থাকে, তবে কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো ফরজ হবে না। মুফাসসিরীন, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহাগণ একমত যে, যদি কাফেররা মুসলিম ভূমির এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও দখল করে, তবে জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এ বিধান আদায়ে মহিলা তার স্বামীর, গোলাম তার মনিবের, ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার, সন্তান তার বাবার অনুমতি ব্যতীতই বের হয়ে পড়বে। ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, আক্রমণকারী শত্রু হলো দ্বীন ও দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। ঈমান আনার পর তাদেরকে প্রতিহত করাই হলো সর্বোচ্চ কর্তব্য। প্রথমে আসে لَا إِلٰهَ إِلَّا الله তারপর আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করার দায়িত্ব। তারপর আসে নামাজ, যাকাত, রোজা, হাজ্জ আদায় করার বিধান।

ইবনে রুশদ বলেন, আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়, তখন তাকে ফরজ হাজ্জের ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। স্পষ্ট করে বললে জিহাদের কারণে নামাজকে বিলম্বিত করা হবে, জিহাদের কারণে রোজাকে বিলম্বিত করা হবে, তবে জিহাদকে কখনো বিলম্বিত করা হবে না। তাহলে আল্লাহর ওপর কিভাবে মাতা-পিতার অনুমতির কথা আসে? তোমার পিতার ওপর ফরয হলো, তিনি ময়দানে তোমার আগের সারিতে থাকবেন। সেখানে ঘরে বসে পাপ কামাই হচ্ছে! তাহলে ফরজ ইবাদাতসমূহের মাঝে অন্যতম ফরজ আদায় করার ক্ষেত্রে একজন পাপীর কাছ থেকে তুমি অনুমতি নিবে?

উম্মতে মুসলিমার আলেমদের প্রতি বার্তা

শায়খ আবু আব্দুল্লাহ উসামা বিন লাদেন রহ.

আহলে হক্ব আলেম, দায়ী ও সংশোধনকারীগণ! আপনাদের ওপর আবশ্যক হলো, আপনারা জিহাদের কাতারগুলোকে সামনে নিয়ে যাবেন, উম্মাহর নেতৃত্ব দেবেন, তাদেরকে পথ নির্দেশনা দেবেন। এটাই তো নবুওয়তের উত্তরাধিকারের চাহিদা। আপনাদের প্রথম কর্তব্য হলো, উম্মাহর সামনে সত্য প্রকাশ করা। প্রয়োজনে দ্ব্যর্থহীনভাবে ভয়-ভীতিকে পেছনে ফেলে অত্যাচারের মুখোমুখি হওয়ার দরকার হলে, তাও করা। এটা তো আল্লাহ আপনাদের কাছ থেকে যে ওয়াদা নিয়েছেন, তারই চাহিদা মাত্র।

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا.فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ

"আর যখন আল্লাহ আহলে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না, তখন তারা সে প্রতিজ্ঞাকে নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল আর এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য অর্জন করে। সুতরাং কতই না মন্দ সেই জিনিস, যা তারা ক্রয় করছে।" -সূরা আলে ইমরান: ১৮৭

আপনাদের ওপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, গোপন করা ও বিভ্রান্ত করার কর্মপন্থা থেকে বের হয়ে আসা। যা দরবারী আলেম ও দরবারী ফতওয়াবাজদের নিত্য নৈমত্তিক কাজ, (কারণ, এরা হল, শাসকদের অভিভাবক) যারা দ্বীনকে নিয়ে ব্যবসা করে। উম্মাহর ওপর বর্তানো দ্বীনের আদেশ-নিষেধকে অস্পষ্ট করে তোলে। দ্বীনকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সম্মানের বিনিময়ে বিক্রি করে।

তাই আপনাদের ওপর আবশ্যক হলো, আমল থেকে বিরত রাখে এমন সব মতপার্থক্যকে মুলতবি করা। কাপুরুষতার উৎপাদনকারী সকল ঝগড়া-ফ্যাসাদকে বন্ধ করা। আপনাদের দায়িত্ব হলো, বিশ্বাস দ্বারা সন্দেহকে খতম করা। দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। দ্বীনের জন্যে দ্রুততরভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা, কেননা সময়ের দ্রুত পরিবর্তন, বিপদের দ্রুত আগমন কাউকে ছেড়ে দেবে না।

আমরা আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, হিম্মতের সাথে উঠে পড়ুন। দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে আসুন। আমরা পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারছি, ইসলামের জন্যে মেহনতকারী বিভিন্ন মতাদর্শীর বিভিন্ন মতপার্থক্যতার কথা না জানার ভান করে থাকা মোটেই শোভনীয় নয়। এটা তো অগ্রহণযোগ্য কাজ। মোটেই যৌক্তিক নয় যে, আমরা শাখাগত মাসআলা ও বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর দ্বারা আবদ্ধ হয়ে থাকবো, শরয়ী আদালত ও শরয়ী পাঠশালাকে বন্ধ রাখবো। বিশেষ করে উম্মাহর সঙ্কটপূর্ণ এ সময়ে।

অন্ধ অনুসরণ থেকে সাবধান

শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ

কোনো দলীল ছাড়া কিংবা শরয়ী দলীলের বিরোধিতায় নিজ পিতৃপুরুষ বা পূর্বসূরীদেরকে অন্ধ অনুসরণ করা চরম ভ্রষ্টতা বৈ কিছুই নয়। আর এটাই হলো কাফেরদের গোমরাহী ও কুফুরীর অন্যতম কারণ; তা আজকের হোক কিংবা পূর্বকালের হোক।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ

"তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ করো। তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করবো। যদি শয়তান তাদেরকে জলন্ত আগুনের (জাহান্নামের) শাস্তির দিকে ডাকে তবুও কি তারা পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করবে?" -সূরা লুকমান: ২১

এরূপ তাকলীদের মানে হলো, বড়দের প্রতি অতিরিক্ত সম্মান দেখানো; আর এমন ধারণা পোষণ করা যে, তাদের দ্বারা কোনো ভুলই হতে পারে না। আজকের আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলিমদের কিছু নেতৃত্বশীল ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে; যারা তাগুতকে সন্তুষ্ট রাখার লক্ষ্যে দ্বীনকে এবং এর মৌলিক বিষয়াদিকে বিকৃত করে।

প্রত্যেক মুসলিমের ওপর আবশ্যক হচ্ছে, তারা মানুষের কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে উত্তম লোকদের। যেমনি আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

"তোমাদের অভিভাবক তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিন বান্দাগণ।" -সূরা মায়েদা: ৫৫

তেমনিভাবে প্রত্যেক মুসলমানের ওপর এ কথা জানা আবশ্যক যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর এ উম্মতের কেউই মা'সুম নন। আর যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো সময় তার পূর্ব অবস্থাতে ফিরে যেতে পারে, মুরতাদ হয়ে যেতে পারে। একদল লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সোহবত পেয়েছিলেন; কিন্তু তারা তাঁর ওফাতের পর মুরতাদ হয়ে যায়। এটা ছিল তাকদীরের লিখন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

فو االله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتي مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فى دخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتي مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها

“আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ জান্নাতী ব্যক্তির মতো আমল করতে থাকবে। এমনকি তার মাঝে ও জান্নাতের মাঝে ব্যবধান থাকবে কেবল একহাত পরিমাণ। তারপর তাকদীর তার ওপর বিজয় হয়ে যায়, ফলে সে জাহান্নামীদের মতো আমল করতে শুরু করে। এমনকি সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ জাহান্নামীদের মতো আমল করতে থাকবে। এমনকি তার মাঝে ও জাহান্নামের মাঝে কেবল এক হাত ফারাক থাকে। তারপর তার ওপর তাকদীর বিজয় হয়ে যায়। আর সে জান্নাতীদের মতো আমল করতে থাকে। এমনকি সে জান্নাতে প্রবেশ করে।” -বুখারী ও মুসলিম

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لاتعجبوا بعمل أحد حتي تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من دهره أو برهة من دهره بعمل صالح لومات دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل زمانا من دهره لومات دخل النار ثم يتحوُّل فيعمل عملاصالحا، فإذا أراد االله بعبد خيرا استعمله قبل موته فوفقه لعم لصالح

“তোমরা কারো আমল দেখে আশ্চর্য হয়ো না, যতক্ষণ না দেখো, তাদের শেষ পরিণতি কী হলো? কেননা কোনো কোনো আমলকারী এমন আছে, সে জীবনের দীর্ঘ সময় ভালো আমল করতে থাকে। এমনকি যদি সে এ অবস্থায় মারা যায়, তবে জান্নাতে প্রবেশ করা নিশ্চিত থাকে; কিন্তু তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যায়। তারপর সে খারাপ আমল করতে শুরু করে। আর এমন কিছু লোক আছে, যারা জীবনের দীর্ঘ সময় ধরে খারাপ আমল করতে থাকে। এমনকি তার অবস্থা এমন হয় যে, সে মারা গেলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কিন্তু তারপর তার অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায়, সে ভালো আমল করতে থাকে। যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দার ভালো চান, তবে তাকে মৃত্যুর আগে সুযোগ দেন। তাকে ভালো আমল করার তাওফীক দান করেন।” -ইমাম আহমদ রহ. বর্ণনা করেন, আলবানী রহ. বলেন এ হাদীসের সনদ সহীহ, আস-সুন্নাহ লি ইবনে আসেম: ১/১৭৪

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

إنما الأعمال بالخواتيم

“সকল আমলের ফলাফল নির্ভর করে শেষ পরিণতির ওপর।” -বুখারী: ৬৬০৭

কেননা জীবিত ব্যক্তি ফেতনা থেকে মুক্ত নয়। সে কিছুদিন পর গোমরাহীর দিকে ফিরে যেতে পারে। ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন,

لايقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر

“তোমাদের কেউ যেন দ্বীনের ক্ষেত্রে কারো অন্ধ অনুসরণ না করে; যদিও ঈমান আনার মতো ঈমান আনে। আবার সে কাফেরও হয়ে যেতে পারে। কেননা মন্দের ভেতরে কোনো কল্যাণ নেই। -ইলামুল মুআকিয়ীন: ২/১৭৬

আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্যে উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন এমন আলেমের সম্পর্কে, যে তার পূর্বের অবস্থার দিকে ফিরে যায়। ঈমান আনার পর আবার কুফরী করে। যেন আমরা অন্ধ অনুসরণ ও গোঁড়ামি থেকে সাবধান থাকি। আল্লাহর দেয়া উদাহরণ,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ– وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث

“আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন সে লোকের কথা, যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য আমি ইচ্ছা করলে সে সকল নিদর্শনসমূহের বদৌলতে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম। কিন্তু সে যে অধঃপতিত এবং নিজের রিপুর অনুগামী হয়ে রইলো। সুতরাং তার অবস্থা হলো কুকুরের মতো; যদি তাকে তাড়া করো তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে।” -সূরা আ'রাফ: ১৭৫-১৭৬

হে আমার ভাই! আপনি দ্বীন শিক্ষা করুন। সত্যকে জানুন, সত্য দিয়ে সত্যবাদীকে চিনতে পারবেন। জানতে পারবেন, কার থেকে দূরে থাকতে হবে; যেন আপনি তাকে প্রতিহত করতে পারেন।

رأي منكرا فليغيره من

“তোমরা খারাপ কাজ দেখলে তাকে পরিবর্তন করে দাও।”

আপনি কারো চাটুকার হবেন না। নেতা যেদিকে যাবে, আপনি তার পেছনে চলে যাবেন এমন যেন না হয়। যখন আপনার নেতা বিকৃত পথে হাঁটা শুরু করবে, তাকে নাসীহা করবেন। প্রত্যাখ্যান করবেন তার কথাকে। আপনার চিন্তার দ্বার বন্ধ করে রাখবেন না। সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য সব সময় মাথায় রাখবেন। যে জাতিই চিন্তার দ্বার বন্ধ করে রেখেছে, তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল জাহান্নাম। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير

“তারা আরও বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম! তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না।” -সূরা মুলক: ১১

পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতিদের পদাঙ্ক অনুসরণে ধ্বংস অনিবার্য

মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ

যখনই মুসলমানরা পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট জাতিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখনই তারা লাঞ্ছিত হতে থাকবে। দাজ্জালী শক্তিগুলো তাদের গ্রাস করতে থাকবে। দেখুন, এ হাদীসে কী বলা হয়েছে–

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتّٰى لَوْ دَخَلُوْا فِىْ جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوْهُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى؟ قَالَ فَمَنْ؟

"আবু সাঈদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– নিঃসন্দেহে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী যমানার লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে সমান সমানভাবে; উদাহরণস্বরূপ বলেছেন, এক হাত এক হাত ও এক বিঘত এক বিঘত করে। এমনকি যদি তারা কোনো গুঁইসাপের গর্তেও প্রবেশ করে থাকে, তবে তোমরাও তাদের অনুসরণে সেখানে প্রবেশ করবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! পূর্ববর্তী লোকদের বলতে কি পথভ্রষ্ট ইয়াহুদি আর খ্রিস্টানদের বোঝাচ্ছেন? উত্তরে তিনি বলেন– তা না হলে আর কারা?"

এখন যদি আমরা এই হাদীসের দিকে একটু খেয়াল করি, তবে কী দেখতে পাই! বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে বেশির ভাগ ঐ সব দোষ-ত্রুটিই পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। জিনা-ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া, প্রতারণা, অন্যায়ভাবে হত্যা, আল্লাহর কালামে বিকৃতি সাধন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন ইতিহাস ও শিক্ষা-দীক্ষাকে ভিন্ন ধাঁচে বিশ্লেষণ, ইয়াহুদিদের মতো ধর্মের এমন বিষয়গুলোকে শুধু আমল করা– যা মনের অনুকূলে হয়, আর যেগুলো কঠিন মনে হয়– সেগুলোকে দূরে নিক্ষেপ করা, এতিম-বিধবাদের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা, নেতৃত্বস্থানীয় লোকদের ভয়ে বা শিল্পপতি লোকদের থেকে টাকা-পয়সা অর্জনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের মনগড়া ব্যাখ্যা করা ইত্যাদি। এ সব দ্বারা কি আদৌ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে?

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقٰى مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اِسْمُه وَلَا يَبْقٰى مِنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا رَسْمُه يَعْمُرُوْنَ مَسَاجِدَهُمْ وَهِيَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ خَرَبٌ شَرُّ ذَالِكَ الزَّمَانِ عُلَمَائُهُمْ مِنْهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَاِلَيْهِمْ تَعُوْدُ

"আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– অচিরেই মানুষের ওপর এমন সময় আসবে, যে সময় ইসলামের নামটি ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকবে না। তা শুধু নামে থাকবে, কোনো ক্ষেত্রেই এর বাস্তবায়ন হবে না। কুরআনের শুধু শব্দ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না (এর বিধানগুলোর বাস্তবায়ন হবে না)। তখন লোকেরা মাসজিদ নির্মাণ করবে; কিন্তু মাসজিদগুলো আল্লাহর স্মরণ থেকে খালি থাকবে। ওই সময়ের সর্বনিকৃষ্ট লোক হবে আলেমরা। কারণ তাদের থেকেই ফেতনার সূচনা হবে এবং তাদের কাছেই তা ফিরে যাবে।" -তাফসীরে কুরতুবি: ১২/২৮০

যদিও বর্তমানে পৃথিবীতে মুসলমানদের সংখ্যা ১৫০ কোটিরও বেশি; কিন্তু ইসলামের অবস্থা কী? অসংখ্য মুসলিম রাষ্ট্র বিদ্যমান, কিন্তু কোথাও কুরআনের শাসন প্রতিষ্ঠিত নেই। মুখের মাধ্যমে তো কালেমা উচ্চারিত হচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আল্লাহ ছাড়া কাউকে বিচারক মানা যাবে না; কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে– আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে অজস্র ইলাহ (বিচারক) বানিয়ে রাখা হয়েছে। সিজদায় পড়ে আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করার মতো লোক তো অনেক আছে; কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে– আল্লাহর নাযিলকৃত পরিপূর্ণ শাসন

ব্যবস্থাকে তারা গণতান্ত্রিক কুফুরি শাসনব্যবস্থার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে। পবিত্র যে কালেমা মুসলমানরা পড়ে থাকে, সেটি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে একটি প্রতিশ্রুতি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া প্রতিটি শক্তি, প্রতিটি বিধানকে (মানবরচিত) অস্বীকার করার জন্যে সদা প্রস্তুত থাকা। প্রকাশ্যে মুখে মুখে বা স্বীয় কার্যকলাপের মাধ্যমে ওই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কাজ করে যাওয়া। কিন্তু বর্তমানের মুসলমান আল্লাহ তাআলাকেও সন্তুষ্ট রাখতে চায়, পাশাপাশি কুফ্ফারদেরকেও অসন্তুষ্ট করতে চায় না। পবিত্র কুরআনে এসব ব্যক্তির পরিচয় এভাবেই বর্ণিত হয়েছে–

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ

“এটা (এই ভ্রান্তি) এ জন্যে যে, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয়কে অপছন্দ করে, তাদেরকে তারা (মুনাফিকরা) বলে– আমরা কিছু কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো। আল্লাহ তাদের গুপ্ত কথাসমূহ ভালোভাবে জানেন।” -সূরা মুহাম্মাদঃ ২৬

অর্থাৎ আমরা কুরআনের কিছু মানবো, কিছু মানবো না। তোমরা যতটুকুর অনুমতি দিবে, ততটুকু মানবো আর যা অমান্য করতে বলবে, তা অমান্য করবো। আল্লাহ এরূপ মুসলমানদের ভ্রান্ত ও বিপদগামী বলে ঘোষণা করেছেন। উল্লিখিত হাদীসে উলামা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অসৎ আলেম। অর্থাৎ আলেমদের মধ্যে কিছু লোক এমন হবে যে, ওই সময়ের মানুষদের মধ্যে তারা হবে সর্বনিকৃষ্ট। তারাই ফেতনার জন্ম দিবে আর এই ফেতনার আগুনে তারাই পুড়ে মরবে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. বলেছেন– কারো মনে যদি বনী ইসরাইলদের অবস্থা জানার শখ জাগে, তাহলে সে যেন তার যুগের উলামায়ে ছু'দের দেখে নেয়। এরা যেমন, ওরাও তেমনই ছিল।

ওহে মুসলমান ভাইয়েরা! আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই ধর্মকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর কোনো প্রকার সন্দেহ বা অস্পষ্টতা রেখে নাযিল করেননি; বরং তা সূর্যের আলো অপেক্ষা অধিকতর জ্যোতির্ময়, চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল এবং আমাদের অস্তিত্বের চেয়েও বেশি বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে একে আল্লাহ পূর্ণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে ওই ধর্মই পছন্দনীয়, যা তিনি চৌদ্দশ' বছর আগে তাঁর প্রিয় হাবীব রাসূলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর অবতীর্ণ করেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. যা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, মুফাসসিরীন, মুহাদ্দিসীন ও ফুকায়ে কেরামগণ স্বীয় জিন্দেগীকে এর জন্যে উৎসর্গ করেছিলেন। উম্মতের ওই সব মহামনীষী দ্বীনকে সঠিকরূপে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রক্তের সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। আর এ ধারা সাহাবা যুগেও ছিল, অদ্যাবধি আছে এবং কিয়ামত পর্যন্তও থাকবে। একটি দল এমনটি করেই যাবে; আর এটিই আল্লাহর ফায়সালা।

তাঁরা যুগের প্রতাপশালী শাসকবর্গের মুখে লাথি মেরে তাদের উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। কখনো দরসে বসে, আবার কখনো ঘোড়ার পিঠে চড়ে। নিজের সব আশা-আকাঙ্খা দ্বীনের জন্যে কুরবান করে দিয়েছিলেন। তাঁরা আমাদের মতো ছিলেন না যে, দুনিয়াও কামাই হবে, আর দ্বীনও ছুটবে না! তাঁরা তাঁদের রবের কাছে শুধুই আখেরাত কামনা করেছিলেন এবং জান্নাতের বিনিময়ে তাঁদের জান-মালকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

এসব ত্যাগ-তিতিক্ষা কুরবানির বিনিময়ে আজও আমাদের পর্যন্ত এ মহান ধর্ম সঠিকরূপে পৌঁছেছে। দুনিয়ায় যত বড় পন্ডিতই পয়দা হোক, কখনো সে আল্লাহর হালালকৃত বিষয়গুলোকে হারাম করতে পারবে না আর আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন, তা হালাল বানাতে পারবে না। কোনো জামাআতের আমীর, শায়খ বা বুজুর্গের এ অধিকার নেই যে, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনীত ধর্মকে পরিবর্তন করে নিজের চাহিদা মতো ঢেলে সাজিয়ে নিবে, চাই সে যত বড় বাহাদুর বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিই হোক। এমন অহংকারী ফেরাউন এবং নিজেকে রব দাবীকারীদের উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্যে যুগে যুগে আল্লাহ রব্বুল আলামীন হক্কের পক্ষে সর্বস্ব ত্যাগকারী তৈরী করেছেন, যারা নিজেদের জান বাজি রেখে এই মহান দ্বীনকে আসল স্বরূপে রেখেছেন। তারা আল্লাহর হালালকৃত বিষয়গুলোকে হালাল ও হারাম বিষয়গুলোকে হারাম সাব্যস্ত করেই ছেড়েছে, যদিও এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পৃথিবীর সব ইসলামবিদ্বেষী মানুষদের সঙ্গে তাঁদের লড়াই করতে হয়েছে। কাটা গায়ে নুন ছিটানোর মতো কথা শুনতে হয়েছে। সব বলশক্তি ও মৌখিকশক্তি এদের বিরুদ্ধে চতুর্দিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে। তাঁরা কোনো তিরষ্কারকারীর তিরষ্কারে ভীত হয়নি। পূর্ববর্তী উলামায়ে হক্ব তাঁদের যা শিখিয়ে গেছেন, তাঁরা তাতেই অটল রয়েছে। বরং তাঁদের আগের উলামায়ে হক্ব তো দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তরে রক্ত ঝরিয়ে স্বীয় ছাত্র ও অনুসারীদের সামনে চলার সাহস যুগিয়েছে।

এ জন্যে মুসলমানদের মনপূজা ছেড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে মনোযোগী হতে হবে এবং এমন হক্বপন্থীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, যাদের কথা ও কাজ কখনো এদিক-সেদিক হয় না, যারা নিজেদের পূজার দিকে নয়; বরং আল্লাহর ইবাদাতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে থাকে। দুনিয়ার ঘোর অন্ধকার থেকে বের করে আখিরাতের উজ্জ্বল স্থায়ী সফলতার দিকে নিয়ে যায়। সন্দেহের গর্ত থেকে বের করে বিশ্বাসের উপত্যকায় নিয়ে যায়। আল্লাহকে ছাড়া পৃথিবীর কোনো পরাশক্তিকেই ভয় করে না। বাতিলকে বাতিল বলে স্বীকৃতি দেওয়ার সাহস বুকে লালন করে। এ রকম হক্বপন্থী উলামাগণই আল্লাহর কাছে বেশি পছন্দের। যারা তাঁদের পছন্দ করবে, আল্লাহ তাআলা তাদের পছন্দ করবেন।

উলামায়ে কেরাম এর
দায়িত্ব ও কর্তব্য

শাইখুল হাদীস আবু ইমরান হাফিজাহুল্লাহ

الحمد لله ربِّ العالمين والصلوة والسلام على سيِّد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সবচেয়ে বড় নেয়ামত হলো দ্বীন। তিনি এই দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে আমাদেরকে দান করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।” -সূরা মায়েদা: ৩

তিনি আরো বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“যে ব্যক্তি ইসলাম ভিন্ন অন্য কোনো দ্বীন অন্বেষণ করবে, তার কাছ থেকে তা কখনোই গ্রহণ করা হবে না আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” -সূরা আলে ইমরান: ৮৫

এটা স্পষ্ট বিষয় যে, ইসলাম ছাড়া ভিন্ন কোনো পন্থা অবলম্বন করা ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। দুনিয়াতে আমরা যে কাজই করি বা যে অবস্থাতেই থাকি; আমরা আমাদের সেই অবস্থা এবং কাজ সম্পাদন করে থাকি, হয়তো নিজেদের মনগড়া পন্থায় অথবা আল্লাহ তাআলার দেয়া পন্থায়। যদি আল্লাহ তাআলা'র দেয়া পন্থা ব্যতীত আমাদের মনগড়া পন্থায় হয়ে থাকে, তাহলে আমরা সর্বাবস্থায় ক্ষতিগ্রস্থ।

দ্বীনের মূল বিষয় হলো, তাওহীদ। তাওহীদের সারাংশ হচ্ছে, "আমার যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস লালন করা যে, আমার কাজটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার দেয়া পদ্ধতিই হলো যথাযথ পদ্ধতি এবং এ পদ্ধতিতে সুফল বয়ে আসবে। এছাড়া যত পদ্ধতি ও পন্থা রয়েছে সবই ক্ষতিগ্রস্ততা, এর পরিণতি আমাদেরকে নিয়ে যাবে ধ্বংসের দিকে। ইসলাম ধর্মের পদ্ধতিই হলো পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র, পৃথিবীর প্রতিটি স্থান এবং প্রতিটি সময়ের ব্যাপারে ইসলাম বিস্তারিত বিধান বর্ণনা করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

"আমি এই কিতাবে কোনো কিছু বাদ দেইনি।" -সূরা আনআম: ৩৮

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

"বস্তুত এই কুরআনে আমি মানুষের জন্যে সব ধরনের বিষয় উল্লেখ করে দিয়েছি।" -সূরা রূম: ৫৮

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই দ্বীন নিয়ে এসেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত এই দ্বীনের মধ্যে আর কোনো পরিবর্তনের অবকাশ নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"যে আমাদের এই দ্বীনের মাঝে এমন কোনো বিষয় উদ্ভাবন করবে, যা এর মধ্যে নেই; তা প্রত্যাখ্যাত।" -সহীহ মুসলিম: ১৭১৮

দ্বীন বলতে কি শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ের ইবাদাত-বন্দেগীকে বোঝায়?

আমাদের একটা সংকীর্ণতা হলো, দ্বীন বলতে আমরা সাধারণত ইবাদাত-বন্দেগীগুলোকেই বুঝি। ইবাদাত-বন্দেগী দ্বীন বটে, তবে এর মাঝেই দ্বীন সীমাবদ্ধ নয়। ঈমানিয়াত, ইবাদাত, মুয়ামালাত, মুয়াশারাত, আখলাক এগুলো দ্বীনের পাঁচটি বড় বড় অধ্যায়। ইবাদাত হলো এই পাঁচটির একটি মাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তির বিশ্বাস ঠিক না হবে, ততক্ষণ তার আমল ঠিক হবে না। ইবাদাতকে যেহেতু আমরা দ্বীন হিসেবে বিবেচনা করি, এ জন্যে বাকি বিষয়গুলোকেও এই আলোকে আলোচনা করবো। ইবাদাতের বড় দিকগুলো যেমন নামাজ, রোযা, হাজ্জ, যাকাত এগুলোকে সবাই ইবাদাত হিসেবে জানে।

আচ্ছা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে যেভাবে নামাজ আদায় করা হতো, এখন কি সেভাবে আদায় করা হচ্ছে না? নাকি এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন এসেছে? নামাজের নতুন কোনো সংস্করণ এসেছে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে নামাজের জন্যে অপরিহার্য শর্ত ছিল অযু, তাহারাত। এখনো তাই আছে। তাহলে বর্তমানে কি শরীয়তে নামাজের বিকল্প ভিন্ন কোনো আমল যুক্ত হয়েছে?, নতুন যুগে নামাজের বিকল্প এখন ভিন্ন একটি কাজ হবে! তাই মূল ইবাদাতের যেমন কোনো বিকল্প সৃষ্টি হয়নি এবং এর কল্পনাও করা যায় না, ঠিক তেমনি এই নামাজ আদায়ের পদ্ধতির মধ্যেও পরিবর্তন কল্পনা করা যায় না।

আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ইবাদাত করার জন্যে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পালন করার পদ্ধতি দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই আল্লাহর এই নির্দেশকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরিকায় পালন করা হলে এটি হবে দ্বীন। আর যদি এমন হয় যে, আল্লাহ পাকের নির্দেশিত ইবাদাত করা হলো; কিন্তু রাসূলের তরিকায় হলো না, তাহলে তা দ্বীন হবে না।

মানুষ সৃষ্টি ও রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য কী?

আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলীর মধ্যে একটা নির্দেশ হচ্ছে, দুনিয়াতে তাঁর দ্বীনকে গালিব করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

"তিনি সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে। যাতে তিনি দ্বীনকে অন্য সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী করতে পারেন।" -সূরা সফ: ৯

তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল কি ইবাদাত-বন্দেগীগুলো ব্যক্তি জীবনে আদায় করে যাওয়া নাকি দুনিয়ার মধ্যে দ্বীনকে গালিব করা? মূলতঃ মানব জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো, আল্লাহর দ্বীনকে গালিব করা। অন্যথায় ব্যক্তিগত ইবাদাতের দিক থেকে ফেরেশ্তারা মানুষের চেয়েও অগ্রগামী। কারণ, আল্লাহ যখন মানব সৃষ্টির ঘোষণা দিলেন, তখন ফেরেশ্তারা বলেছিলেন,

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

"আমরা আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি।" -সূরা বাক্বারাহ: ৩০

আল্লাহ তাআলাও তাদের এই ইবাদাতকে অস্বীকার করেননি। তিনি নিজেই ফেরেশ্তাদের ইবাদাতের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। কুরআনে কারীমের ভাষ্য হলো, "ফেরেশ্তারা এক মুহূর্তও আল্লাহর ইবাদাত থেকে অবসর গ্রহণ করেন না।"

হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আকাশের অর্ধহাত জায়গাও এমন নেই, যেখানে ফেরেশ্তারা সেজদারত নেই। তাহলে ফেরেশ্তাদের সংখ্যা কত? আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

"তোমার রবের সেনাবাহিনীর সংখ্যা তিনিই জানেন।" -সূরা মুদ্দাছ্ছির: ৩১

ফেরেশ্তারা আল্লাহর এই পরিমাণ ইবাদাত করা সত্ত্বেও তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাহলে ফেরেশ্তারা যেই প্রকারের ইবাদাত আদায় করছে; সেই প্রকারের ইবাদাতের জন্যেই কি মানুষদের সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেছেন,

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।" -সূরা বাক্বারাহ: ৩০

সে উদ্দেশ্য তো আল্লাহ ব্যক্ত করে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জিন আর ইনসানকে আমার ইবাদাতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।" -সূরা যারিয়াত: ৫৬

মানুষ সৃষ্টি করেছি তো আমার ইবাদাতের জন্যে। ফেরেশ্‌তারা যেমন ব্যক্তিগত ইবাদাতগুলো পালনে রত আছে, সেই ধরনের ইবাদাতের জন্যে নয়। সেটা আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন; তা হলো, "আমি রাসূলকে পাঠিয়েছি দ্বীনকে গালিব করার জন্যে। তাই যারা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হবে, তাদের ওপরেই সর্বাধিকভাবে এবং সবার চেয়ে বেশি এই দায়িত্ব অর্পিত হবে। অতএব দ্বীনকে গালিব করার দায়িত্ব আলেমদের ওপর। আর এটা আল্লাহর একটি ফরয ইবাদাত; বরং যেই ইবাদাতগুলো আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য, সেগুলোর একটি।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি কি ইসলামে নির্ধারিত নেই?

যেই ইবাদাতের উদ্দেশ্যে আম্বিয়া আ. এর প্রেরণ এবং এই জন্যেই মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। বিষয়টি কখনো এমন হতেই পারে না যে, এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতের তরিকা আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিবেন না। অতএব, দ্বীনকে গালিব করার পদ্ধতি আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। তাছাড়া হাদীসেও বর্ণিত আছে যে, এই ধরনের মানুষগুলোর মাধ্যমে দ্বীন বিজয়ী থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুয়তের ২৩ বছরের যিন্দেগীতে কুরআন ও হাদীসের এই ঘোষণাকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন।

আল্লাহর জমিনে তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার পক্ষে পবিত্র কুরআনে অসংখ্য আয়াতে কারীমা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আদেশ করছেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

"ফিতনা নির্মূল হওয়া পর্যন্ত এবং দ্বীন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর জন্যে হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।" -সূরা আনফাল: ৩৯

দুনিয়া থেকে ফিতনা নির্মূল করা ও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থাপত্র হিসেবে আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের বিধান দিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রদত্ত প্রেসক্রিপশনে লিখে দিয়েছেন, "তোমরা কিতাল করো।" আল্লাহ তাআলার চেয়ে বড় চিকিৎসক আর কেউ আছে কি? যদি নাই থাকে, তাহলে ফিতনা নির্মূল করার জন্যে তিনি যেই চিকিৎসা দিয়েছেন; তাহাই প্রয়োগ করতে হবে। ফিতনাটা চাই ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, জাতীয় কিংবা পৃথিবীব্যাপী হোক, সব ধরনের ফিতনা নির্মূলের মাধ্যম হিসেবে আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের বিধান দান করেছেন। কারণ, আলোচ্য আয়াতের মধ্যে ফিতনা শব্দটি নাকেরা তথা অনির্দিষ্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

আর এই আয়াতের দ্বারা বুঝা যায়, কিতালের দ্বারা দ্বীন প্রতিষ্ঠা হবে। এখানে অস্পষ্টতার কিছুই নেই। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যুদ্ধ করবে।" -সহীহ মুসলিম: ১৯২৩

আরো বর্ণিত হয়েছে,

لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا، يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ

"এই দ্বীন সর্বদা কায়েম থাকবে, কিয়ামত আসা পর্যন্ত মুসলমানদের একটি দল এই দ্বীনের সংরক্ষণের জন্যে লড়াই করতে থাকবে।" -সহীহ মুসলিম: ১৯২২

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী রহ. বলেছেন, এই দলটির কিতালের কারণে দ্বীন কায়েম থাকবে। তাহলে হাদীসের বক্তব্যও স্পষ্ট। কাফেররা আমাদেরকে দ্বীন থেকে ফিরানোর জন্যে তাদের সাধ্যমত সর্বদা কিতাল করতে থাকবে। দ্বীনের মতো নেয়ামতটা ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে তারা আমাদের ওপর সশস্ত্রযুদ্ধ চালিয়ে যাবে। তাহলে সশস্ত্র যুদ্ধের মোকাবেলায় আমাদের কী করা উচিত? স্বাভাবিক বিবেকেও বলে, তাদের মোকাবেলায় তাদের মতো সশস্ত্রই হতে হবে।

তারা আসবে সশস্ত্র অবস্থায়, আর আমি তার মোকাবেলা করবো নিরস্ত্র অবস্থায়! তাহলে বিবেকবানের বিবেক কী বলবে? বরং তারা যখন তোমার ওপর কিতাল চালিয়ে যাবে, সুতরাং তোমার দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যে তুমিও কিতাল করো। বিষয়টি খুবই স্পষ্ট।

দ্বীন কায়েমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রচেষ্টা কেমন ছিল?

এবার লক্ষ্য করি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনীর প্রতি। তিনি মক্কায় দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৩ বছর মেহনত করেছেন। মেহনত কিন্তু রাসূলের ছিল। রাসূলের চেষ্টা, আখলাক, ঈমান ইত্যাদি বিষয়ে কেউ কি সেই পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে? হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, সকল নবীকে আল্লাহ তাআলা যত বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন, তার মধ্যে অতিরিক্ত আরো পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে। এর মধ্য হতে একটি হলো জাওয়ামিউল কালিম; অর্থাৎ তাঁকে অল্প কথায় অনেক কিছু বোঝানোর যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত তিনি ছিলেন আরবের মধ্যে সর্বাধিক স্পষ্টভাষী ও সুসাহিত্যিক। তাই মক্কায় দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে সুন্দরভাবে বুঝানো আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়। তার ওপর ছিল তাঁর দরদ ও ভালোবাসা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

"তাদের ঈমান না আনার দুখে মনে হচ্ছে, আপনি নিজেকে ধ্বংস করে দিবেন।" -সূরা শুআরা: ৩

তিনি ছিলেন মহান চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

"আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।" -সূরা কলম: ৪

এতসব গুণাবলী নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন মানুষগুলোর পেছনে মেহনত করেছেন, যাদের মধ্যে রয়েছে খালিদ বিন ওয়ালিদ, ইকরামা বিন আবু জাহল,আবু সুফিয়ান ইবনুল হারেস, আবু সুফিয়ান ইবনুল হারব এবং আমর ইবনুল আস, আমর ইবনু মাদি কারব, তুলাইহা আসাদি রাযি. সহ পরবর্তীতে ইসলামের বড় বড় তারকারা। এদের পেছনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

দীর্ঘ ১৩ বছর যাবৎ সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন। তবুও কি দ্বীন বিজয়ী হয়েছে?

দ্বীন বিজয়ী হওয়া তো দূরের কথা বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই-হি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে মক্কাতেও থাকতে পারেননি। বাধ্য হয়ে মদীনায় হিজরত করেছেন। মদীনায় মাত্র ১০ বছর মেহনত করার পর সেখানে দ্বীন বিজয়ী হয়েছে কি হয়নি? সেখানে দ্বীন বিজয়ী হয়েছে এবং ফিতনাও নির্মূল হয়েছে। তাহলে আল্লাহ তাআলার ঘোষণার সাথে মিলিয়ে দেখুন, কোন আমলের দ্বারা দ্বীন বিজয়ী হয়েছে এবং ফিতনা দূর হয়েছে? কুরআনে কারীমে কোন আমলের কথা উল্লেখ করা আছে এবং কোন জামাআতের দ্বারা দ্বীন বিজয়ী থাকার ঘোষণা দিয়েছেন?, মুকাতিলদের দ্বারা।

মোল্লা আলী ক্বারী রহ. এর এই স্বীকত ব্যাখ্যার বিরোধিতা করার কোনো সুযোগ নেই। অর্থাৎ এই দলের কিতালের ফলে দ্বীন বিজয়ী থাকবে। আর সেই আমলের চর্চা মদীনার যিন্দেগীতে হয়েছে এবং এই কারণেই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে ৯ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা ছিল সম্পূর্ণ ফিতনা মুক্ত ও তাতে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহলে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ ও পদ্ধতি কুরআন, হাদীস এবং রাসূলের জীবনে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে।

দ্বীন কায়েমে সাহাবায়ে কেরামদের প্রচেষ্টা

এবার আমরা সাহাবায়ে কেরামদের জীবনীর প্রতি লক্ষ্য করি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষ দিকে উসামা রাযি. এর বাহিনীকে যুদ্ধের জন্যে বের করে ইন্তেকাল করেছেন। এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসীন বা ঐতিহাসিকদের কোনো মতানৈক্য নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার আগ মুহূর্তে যেই আমল জারি করেছেন, তা সাহাবায়ে কেরাম রাযি.ও জারি রেখেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় মুআবিয়া রাযি. এর সময়ে ৬৪ লক্ষ বর্গমাইলের মধ্যে ফিতনা মুক্ত করে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আর রাসূলের যমানায় ছিল ৯ লক্ষ বর্গমাইল।

তাহলে বুঝা গেল, দ্বীন বিজয়ের এই ব্যবস্থা শুধু রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর নির্দিষ্ট নয়, বরং পরবর্তীদের প্রতিও এই একই দায়িত্ব ছিল। যার ফলে রাসূলের যুগে যেমন এ পদ্ধতি পালন করা হয়েছে; তেমনি পরবর্তীতেও ব্যাপকভাবে এটাকে গ্রহণ করা হয়েছে। রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের যেই অংশে ক্বিতালের চর্চা হয়নি, সেই অংশে দ্বীনও বিজয়ী হয় নাই এবং ফিতনাও নির্মূল হয়নি। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, বিজয়ের জন্যে যেই পদ্ধতি আমি ঘোষণা করে দিয়েছি এবং রাসূল বলে দিয়েছেন, তা ব্যতীত চেষ্টা যদি রাসূলের মাধ্যমেও হয় তবুও দ্বীন বিজয়ী হবে না।

তাহলে একটি প্রশ্ন আসে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মক্কার জীবন কি তাহলে ব্যর্থ? না, ব্যর্থ নয়; বরং দ্বীনের এই সবকটা শেখানোর জন্যে আল্লাহ তাআলা এভাবে নকশা এঁকেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের প্রথমাংশে বিজয় না আসা এবং পরবর্তীতে কিতালের মাধ্যমে বিজয় আসার দ্বারা আমাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত ইহা একটি শিক্ষা হয়ে আছে। তাছাড়া তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এই বিধান দেওয়া হয়নি। সে সময় যতটুকু ফরজ করা হয়েছে, ততটুকু যারা মেনেছেন, তারা কামিয়াব হয়েছেন।

মূসা আ., ঈসা আ. এর ওপর পূর্ণাঙ্গ ইসলাম নাযিল করা হয়নি। ইসলাম পরিপূর্ণ হয়েছে রাসূলের জীবনের শেষ সময়ে। মূসা আ. এর সময় যেই দ্বীন ছিল, সেই দ্বীন অনুযায়ী যারা আমল করেছে, তারা অবশ্যই নাজাত পাবে। কিন্তু বর্তমানে যদি সেই দ্বীন অনুযায়ী কেউ আমল করে, তাহলে সে নাজাত পাবে না। মক্কী জীবনে ইসলামের অনেক বিধি বিধান নাযিল হয়নি বিধায় তারা সে সময় তা পালন করা ছাড়াই পূর্ণ মর্যাদা পেয়েছেন। আল্লাহ তাআলার নিকটও তাঁরা ছিলেন পরিপূর্ণ মাকবুল। কিন্তু কোনো বিধান নাযিল হয়ে যাওয়ার পর তা ছেড়ে দিলে আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে? কেউ যদি বর্তমানে পরিপূর্ণভাবে মূসা আ. এর ধর্ম পালন করে, সে যেমন সফল হবে না, তেমনিভাবে যে মক্কার জিন্দেগীকে পরিপূর্ণভাবে পালন করে সেও সফল হবে না।

যেমন, রোজা ফরজ হয়েছে ২য় হিজরীতে। তাহলে কেউ যদি এই অজুহাতে রোজা ছেড়ে দেয়, রোজা ফরজ হয়েছে নবুয়তের ১৫ বছর পর; সুতরাং আমিও মুসলমান হওয়ার ১৫ বছর পর রোজা রাখা শুরু করবো। কোনো অমুসলিম এই মাত্র মুসলমান হলে সে কি ১৫ বছর পর রোজা রাখা শুরু করবে নাকি এখনি? তাকে এখন থেকেই শুরু করতে হবে। এখন যদি রমজানও হয়ে থাকে, তাহলে যেই রোজার দিন মুসলমান হয়েছে, সেই দিন তো আর রোজা পূর্ণভাবে রাখা সম্ভব হচ্ছে না; তবুও ফুকাহে কেরাম বলেছেন, সেদিন সে উপবাস থাকবে।

এমনিভাবে সুদ মক্কার জীবনে হারাম ছিল না। মদীনার শুরুর জীবনেও হারাম হয়নি; বরং সুদ পূর্ণাঙ্গভাবে হারাম হয়েছে বিদায় হাজ্জের সময়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাহিলী যুগে সুদের যত ব্যবস্থা আছে, আজ সবগুলো রহিত করা হলো। এর পূর্বে অনেকেই সুদের সাথে জড়িত ছিল। এখন যদি আমরা এই অজুহাত দেখাই, মক্কার জীবনে মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ ছিল, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ছিল না। তারা অর্থ সংকটে জর্জরিত ছিল। তাই সে সময় সুদের অবকাশ ছিল। মদীনায় আসার পর মুসলমানদের অর্থনৈতিক সংকট আর থাকেনি, কারণ যুদ্ধলব্ধ মাল মুসলমানদের হাতে চলে এসেছে এবং নিজেদের মধ্যেও সহমর্মিতার উদয় হয়েছে। তাদের অবস্থা ছিল এমন, নিজেরা প্রচন্ড ক্ষুধার মধ্যে থাকলেও অপর ভাইকে খাবারটা দিয়ে দেয়। যুদ্ধের মুহূর্তে জান চলে যাচ্ছে, এমন সময় নিজে পানি পান না করে অন্য ভাইকে পানি দিয়ে দিচ্ছে।

একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়ে বলেন, যে কোনো সম্পদ রেখে যাবে, তা তার আত্মীয় ও সন্তানরা পাবে। কেউ যদি ঋণ বা বাচ্চা রেখে মারা যায়, তাহলে তার দায়ভার আমার।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন। আর তাঁর কাছ থেকে এমন ঘোষণা। সেই সমাজে কেউ কাউকে ধার দিয়ে তা না পাওয়ার কোনো আশংকাই রাখতো না। তাহলে সেই সমাজে তো সুদ খাওয়ার প্রয়োজনই নেই। এমন সমাজ কায়েম হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন যে, সুদ হারাম। যে সুদ খাবে তার সাথে আল্লাহর সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করা হলো। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জীবনের সেই মুহূর্তে সুদ অবৈধতার ঘোষণা স্পষ্ট বর্ণনা করে দিয়েছেন।

এই যুক্তি পেশ করে যদি আমরা বলি, বর্তমানে সরকারের পক্ষ থেকে এমন কোনো ধারের ব্যবস্থা নেই, যুদ্ধলব্দ মালের দ্বারা আমরা সমৃদ্ধও না, কেউ কাউকে ধারও দেয় না, মুসলমানদের মাঝে সেই সহমর্মিতাও নেই; সুতরাং এই দুরাবস্থায় সুদ খাওয়া হারাম নয়। এই কথা বলার কোনো অবকাশ আছে? এই পর্যন্ত কোন মুফতী, মুহাদ্দিস, আলেম,ফকীহ এমন কথা বলেছেন? বলেন নাই। এই যুক্তিতে এখন কেউ সুদকে হালাল বলতে পারবে না। এই জন্যে বলতে পারবে না; কারণ, আগের অবস্থা যাই থাকুক, আল্লাহর পক্ষ থেকে তখন হারাম ঘোষণা করা হয়নি। যখন হারামের নির্দেশ এসে গেছে, তখন যুক্তির আলোকে ইহাকে আর হালাল বলার সুযোগ নেই।

শরীয়তের কিছু বিষয় এমন প্রতিষ্ঠিত ও অবিচলিত; যেগুলোর মধ্যে কোনো পরিবর্তনের অবকাশ নেই। এমনিভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতির মধ্যে কেউ পরিবর্তন আনতে পারবে না। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন দ্বারা আল্লাহ তাআলা সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে কুরআনের ঘোষণা, রাসূলের আমল, সাহাবাদের আমল চোখের সামনে স্পষ্ট এবং সূর্যের মতো পরিস্কার। সাহাবায়ে কেরাম সমগ্র পৃথিবীতে কিতাল নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা কে সাহায্য করার মাধ্যম হলো কিতাল

আল্লাহ বলেন,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

“আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দলের মাধ্যমে প্রতিহত না করতেন, তবে ধ্বংস করে দেওয়া হত খানকা, গীর্জা, ইবাদাতখানা ও মাসজিদসমূহ; যেখানে আল্লাহর নাম বেশি বেশি স্মরণ করা হয়।” -সূরা হাজ্জ: ৪০

তাহলে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিহত করার বিধান না থাকার কারণে মসজিদ ধ্বংস হয়; তালিম, যিকির, ইত্যাদি না থাকার কারণে নয়। প্রতিহত করার ধরনও আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করে দিয়েছেন। আল্লাহকে যে সাহায্য করবে, আল্লাহও তাকে সাহায্য করবেন। তাহলে আল্লাহকে সাহায্য করে যখন কেউ প্রতিহত করবে, তখন আল্লাহও তাকে সাহায্য করবেন। আর যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, তখন মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করবে। অতএব দলে দলে মানুষ আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করার মাধ্যম হলো বিজয়। পরাজিত জাতির আর্দশ কেউ গ্রহণ করে না। আর বিজয়ী জাতির আর্দশ গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা লাগে না; বরং বিজয়ী হয়ে গেলে মানুষ এমনিতেই তা গ্রহণ করে। বর্তমানে পাশ্চাত্যের আদর্শ মুসলমানরা গ্রহণ করছে ইসলামের চেয়েও তাদের আদর্শ সুন্দর, এ জন্যে নয়; বরং তারা বিজয়ী সে জন্যে। আর মুসলিমরা আজ পরাজিত। তাই তাদের আদর্শ যত যুক্তিযুক্ত, আল্লাহ প্রদত্ত হোক স্বয়ং মুসলিমরাই তা গ্রহণ করছে না। এগুলো তাদের কাছে অপমান ও ঘৃণার বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

একটা সময়ে যখন ইসলাম বিজয়ী ছিল, তখন কাফেররা দলে দলে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাহলে বর্তমানের ৬০০ কোটি কাফেরের দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করার পদ্ধতি হলো কিতাল। এমনটি হলে যে কোনো ব্যক্তি জাহান্নামের পথ থেকে জান্নাতের পথে চলে আসবে। তাহলে বুঝা গেল, বিজয় আসবে আল্লাহর সাহায্য দ্বারা। আল্লাহকে সাহায্য করলে তিনিও সাহায্য করবেন। আল্লাহ বলেন,

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ

“যদি তোমরা আল্লাহকে (তাঁর দ্বীনের) সাহায্য করো, তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।” -সূরা মুহাম্মাদ: ৭

অন্য আয়াতে তিনি তাঁকে সাহায্য করার মাধ্যমও বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ

“এবং আমি লোহা অবতীর্ণ করেছি, তাতে আছে যুদ্ধশক্তি ও মানুষের জন্যে বহুবিধ উপকারিতা। এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ জানতে চান, কে তাঁকে না দেখে তাঁর (দ্বীনের) ও তাঁর রাসূলগণের সাহায্য করে।” -সূরা হাদীদ: ২৫

তাহলে লোহা নাযিল করার উদ্দেশ্যের মধ্যে আল্লাহ তাআলা তাঁর সাহায্যের ব্যাপারটা নিহিত রেখেছেন। আমরা বিভিন্ন কিছুকে আল্লাহর সাহায্য বলে থাকি। অথচ, আল্লাহ নিজেই সাহায্য হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন, লোহা দ্বারা সাহায্য করাকে। অর্থাৎ আমি লোহা নাযিল করেছি এ জন্যে যে, আমি দেখবো কে আমাকে সাহায্য করে? তাছাড়া আল্লাহকে সাহায্য করা হলে তিনিও সাহায্য করেন। আর আল্লাহ সাহায্য করলে বিজয় আসবে। আর লোহা দ্বারা সাহায্য করাটা হলো কিতাল। কারণ, লোহা দ্বারা অস্ত্র তৈরি করা হয়। কিতালই হলো প্রকৃত প্রতিহতকরণ, যার দ্বারা দ্বীন বিজয় হবে।

তিনি আরো বলেন,

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ

“তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, তোমাদের হাত দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন।” -সূরা তাওবা: ১৪

তারা তো আযাবের উপযুক্ত হয়ে আছে। আর তা দিবেন আল্লাহ তাআলা; তোমরা নও। যেহেতু আল্লাহ তাআলা তোমাদের হাত দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দিবেন, তাই তোমাদেরকে বলা হচ্ছে যুদ্ধ করার জন্যে। যদি আল্লাহ তাদেরকে তাঁর কুদরতি আযাব দিতেন; তাহলে তো জাহান্নামই যথেষ্ট। তোমাদের আর কি প্রয়োজন? দুনিয়াতে তাদেরকে আযাব দেয়ার জন্যে আল্লাহর কোনো তাড়া নেই। আখেরাতেই তিনি শাস্তি দিতে পারবেন। তাদেরকে জ্বালানোর জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট।

অতএব তাদেরকে পরাজিত করতে হলে তাদের মোকাবেলা করো। যদি তুমি হাত দ্বারা কিতালের জন্যে প্রস্তুত হও, তাহলে আল্লাহ এখনো তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

আল্লাহ তাআলা আসবাব অনর্থক সৃষ্টি করেননি

তাদের মোকাবেলা করার জন্যে তুমি তোমার আসবাব গ্রহণ করলে আল্লাহ তাআলাই ফলদায়ক করে দিবেন। আবার এই ভরসা করো না যে, তোমার আসবাবের দ্বারা তারা প্রতিহত হবে। মুসলমান আর নাস্তিকের মধ্যে পার্থক্য এখানেই যে, মুসলমানও আসবাব গ্রহণ করে এবং নাস্তিকও আসবাব গ্রহণ করে। নাস্তিক ভাবে, আসবাবের বলেই সে কিছু করে ফেলবে। আর মুসলিম ভাবে, সে আসবাব অবলম্বন করবে আর সম্পাদন করবে আল্লাহ। তাহলে আসবাব অবলম্বন না করার মানে হলো এই যে, "হে আল্লাহ আপনি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেছেন"। আসবাব তৈরি করেছেন আল্লাহ তাআলা। আর আসবাব গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়। এটাও তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত এবং তাকদীর।

আবু উবায়দাহ ইবনুল যাররাহ রাযি. উমর রাযি. কে বলছিলেন, মহামারী আক্রান্ত এলাকা থেকে পালানোর চেষ্টা করে আল্লাহর তাকদীর থেকে ভাগার চেষ্টা করছেন? তখন উমর রাযি. বললেন, হে আবু উবায়দা! আপনি ছাড়া অন্য কেউ বলতো যদি! এটা আপনার মুখে মানায়নি। হ্যাঁ, আমি আল্লাহর এক তাকদীর থেকে পালিয়ে অন্য তাকদীরের দিকে যাচ্ছি।

ভরসা করতে হবে একমাত্র আল্লাহর ওপর

তাহলে যেই ফলাফলই চাই আমরা, সেই ফলাফলের জন্যে আমাদেরকে আসবাব গ্রহণ করতে হবে। তারপর আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হবে; বরং এটাই হচ্ছে আসল তাওয়াক্কুল। আসবাব পরিত্যাগ করা যেমন ভ্রান্তি, আসবাবের ওপর নির্ভর করাও তেমনি ভ্রান্তি। স্বাভাবিকভাবে সৈন্য সংখ্যা যদি বেশি হয়, তাহলে মনে হয় যে, আমরা বিজয়ী হবো। হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা আগের তুলনায় বেশি ছিল; তাই তাদের ভরসা আসবাবের ওপর ঝুঁকার কারণে পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল।

তারা ভেবেছিল, বদরে আমরা অল্প সংখ্যক থেকেও বিজয়ী হয়েছি; তাহলে আজ তো আমরা অনেক বেশি। বিজয় তো আমাদেরই হবে। দুর্বল থাকাবস্থায় পূর্ণ ভরসা ছিল আল্লাহর ওপর। তাই আল্লাহ তোমাদেরকে বিজয় দান করেছেন। আর হুনাইনে তোমাদের কিছুটা আসবাবের ওপর ভরসা আসার ফলে প্রথমে পরাজয় ও পরে দিল ঠিক হয়ে যাওয়ায় আবার জয়ী করে দিয়েছেন।

মুসলমান আসবাবের ওপর ভরসা করবে না। যদি এমনি হয় তাহলে তার ঈমান ত্রুটিযুক্ত হয়ে গেল। এ জন্যে বান্দা আসবাবের ওপর ভরসা করলে, আল্লাহ সেই আসবাব দ্বারাই তাকে পরাজিত করবেন। বিজয়ের রহস্যটা হলো, আসবাব থাকা সত্ত্বেও মনে করা যে, আসবাব কিছুই না; বরং সব কিছু করেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। বিজয়ের জন্যে আল্লাহ লোহা দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেছেন, "আমাকে সাহায্য করো।" আর আল্লাহকে সাহায্য করার মাধ্যম হলো লোহা। তাহলে আল্লাহও তোমাকে সাহায্য করবেন। আর তিনি সাহায্য করলে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। দলে দলে মানুষ ইসলামের পানে ছুটে আসবে। আল্লাহর দেওয়া এই ব্যবস্থা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এই উম্মাতের মধ্যেও এই ব্যবস্থা চলতে থাকবে। এই পথে যেই পরিমাণ লোক থাকবে, সেই পরিমাণ দ্বীন প্রতিষ্ঠিত থাকবে; কাফেরও সেই পরিমাণ প্রতিহত হবে।

কিতালের মাধ্যমে ঈমানের দাবী বাস্তবায়িত হবে

সহীহ হাদীস সমূহে ইমাম মাহদি আ. এর যে কার্যবিবরণী উল্লেখ আছে; তাও হচ্ছে, কিতাল এবং তাঁর সময়ও দ্বীন বিজয়ী হবে। আবার ঈসা আ. আসার পরেও সবচেয়ে বড় শত্রুর মোকাবেলায় কিতাল করবেন এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে। যেই পরিমাণ আর কখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি, হবেও না। তাহলে শুরুতেও দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিতালের মাধ্যমে, মাঝেও প্রতিষ্ঠিত আছে কিতালের মাধ্যমে এবং শেষেও প্রতিষ্ঠিত হবে কিতালের মাধ্যমে।

অতএব বুঝা গেল, দ্বীনকে গালিব করার জন্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দেওয়া ব্যবস্থা হলো কিতাল। এটা কোনো সময় বা ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত নয় যে, রাসূল যতদিন ছিলেন ততদিন এটি কার্যকর থাকবে; বরং পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে গেলেও এ ব্যবস্থা বন্ধ হবে না। এই জন্যে রাসূলের ওফাতের পর যখন বিভিন্ন জনের অবস্থা পরিবর্তণ হয়ে গিয়েছে। তখন আবু বকর রাযি. বলেন, যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইবাদাত করতো; তবে শোনো, মুহাম্মাদ তো ইন্তেকাল করেছেন আর যে মুহাম্মাদের রবের ইবাদাত করতো; তবে তিনি তো জীবিত আছেন। সুতরাং রাসূল চলে গেলেও তিনি যেই বিধান রেখে গিয়েছেন; তা অবশ্যই চালু থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি নিজ দ্বীন থেকে ফিরে যায়, তাহলে আল্লাহ এমন এক জাতি নিয়ে আসবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে একং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করবে না।" সূরা মায়েদাঃ ৫৪

তাহলে যখন দ্বীন বিমুখিতার রোগ শুরু হবে, তখন আল্লাহ অন্য আরেকটি জাতি নিয়ে আসবেন। আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসা ও তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহকে ভালোবাসা তো অন্তরের বিষয়। এটা তো চোখে দেখার মতো কোনো বিষয় নয়; কিন্তু এটার প্রকাশ ঘটেছে পরবর্তীতে তাদের গুণসমূহ বর্ণনা করার দ্বারা; তা হলো, তারা মুমিনদের প্রতি হবে সদয় এবং কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর।

এই আয়াতের প্রেক্ষাপট হলো এমন, মানুষ মুরতাদ হয়ে যাবে। মুসলমান সন্তানেরা মুরতাদ হচ্ছে কি হচ্ছে না? হচ্ছে এবং তারা দ্বীন

ছেড়ে দিচ্ছে। তাহলে যখন ইরতেদাদ ও দ্বীন বিমুখিতার অবস্থা চলতে থাকবে, সে সময় চিকিৎসা হিসেবে আল্লাহ তাআলা কিতা-লের বিধান দিয়েছেন। তিনি এমন এক জাতি নিয়ে আসবেন; যাদেরকে তিনি ভালোবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসে। তারা হবে মুমিনদের প্রতি দয়াবান। তাহলে ইরতেদাদ যদি চলতে থাকে, এমন অবস্থায় মুমিনদের প্রতি দয়াবান একটি জামাতের প্রয়োজন।

পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে ঈমানের কারণে মুমিনদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে, পোড়ানো হচ্ছে, ধর্ষণ করা হচ্ছে। যদি এমন হয়ে থাকে। তবে সব মুমিন এক দেহ নয় কি? দেহের কোনো অংশে আঘাত লাগলে বাকি অংশগুলোও অস্থির হয়ে যায়। এখন সেই মুমিনদের প্রয়োজন; যাদের ভিতর নির্যাতিতদের জন্যে যন্ত্রণা থাকবে। যদি তাদের অন্তরে তা না থাকে; তবে কি তাদেরকে সত্যিকারের মুমিন বলা যাবে? দেহের একটা অংশে আঘাত পেলে তো সম্পূর্ণ দেহই যন্ত্রণায় ভোগে।

হাদীসে তো মুমিনদেরকে একটি দেহের সাথেই তুলনা করা হয়েছে। তাহলে আমাদের মধ্যে কতটুকু যন্ত্রণা কাজ করে তাদের জন্যে? অন্তর থেকে না আসলেও যে কাজটা করণীয়, সে কাজটা তো আমরা নিজের মধ্যে আনতে পারি। অন্তরে জ্বালা অনুভব হওয়া আমার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে; কিন্তু যন্ত্রণা থাকলে যেই কাজ আমি করতাম, তা তো করতে পারি। আমার মুমিন ভাইকে মারছে। যদি আমার দরদ থাকতো, তবে তো তাকে উদ্ধারের জন্যে আমি ঝাঁপিয়ে পড়তাম। যদি এমন না হয়; তাহলে এর দৃষ্টান্ত দেহের সেই অঙ্গের ন্যায়, যেগুলো অন্য দেহ আক্রান্ত হলে ব্যথা অনুভব করে না। যেমন চুল, দাড়ি, মোচ ইত্যাদি।

কোথাও আঘাত লাগলে যেমন এগুলোতে ব্যথা অনুভব হয় না, তেমনি এদের গায়ে আঘাত লাগলে দেহ ব্যথা পায় না। অনুরূপ আমরাও মুসলমান ঠিক, তবে মুসলমানের চুল-দাড়ির মতো। "বেদু-ঈনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আল্লাহ বলেন, বরং তোমরা বলো, আমরা মুসলমান হয়েছি।" ঈমানের দাবী করো না। আরে মুমিন তো হলো সে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। অতঃপর সন্দেহে নিপতিত হয়নি এবং জান মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। তারাই হলো সত্যবাদী।"

তুমি চুল দাড়ি রেখে ঈমানের দাবী করছো! অথচ অপর ভাইয়ের ব্যথায় তুমি ব্যথিত হলে না। এমন করুণ মুহূর্তে তো করণীয় হচ্ছে, মুমিনদের প্রতি দয়াবান ও কাফেরদের প্রতি কঠোর হওয়া। মুসলমানরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আক্রান্ত হয়ে আছে; অথচ আমাদের অন্তর বিগলিত হয় না। কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে, আক্রান্ত মুসলিমরা অভিভাবক ও সাহায্যকারী চাচ্ছে। এই অভিভাবক ও সাহায্যকারী এসে মাজলুমদের উদ্ধারের জন্যে কিতাল করবে। কারণ, আল্লাহ বলছেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

"তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় কিতাল করছো না? অথচ, দুর্বল নর-নারী ও শিশুরা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই জালিম অধ্যুষিত জনপথ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নাও। এবং আমাদের জন্যে তোমার পক্ষ হতে একজন অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং আমাদের জন্যে তোমার পক্ষ হতে একজন সাহায্যকারী দাঁড় করিয়ে দাও!" -সূরা নিসা: ৭৫

আল্লাহ বলছেন, মাজলুমদেরকে উদ্ধারের জন্যে তোমরা কিতাল করছো না কেন? তাহলে যে কিতাল করতে যাবে, সে মুসলিমদের অবিভাবক। সে আল্লাহর সাহায্য পাবে আর অন্তর্ভুক্ত হবে তায়েফ-ায়ে মানসূরার; হাদীসে যেই তায়েফার ব্যাপারে বলা হয়েছে।

মুমিনদের সাথে কাফেরদের শত্রুতা চিরন্তন

মুমিনদের আরেকটি গুণ হলো, তারা কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর হবে। আমরা লক্ষ্য করি, পৃথিবীতে বর্তমানে কাফেরদের প্রতি বেশি কঠোর কে? নিশ্চয়ই মুজাহিদগণ। আর কাফেরদের প্রতি কঠোর হওয়াই আল্লাহর নির্দেশ। আর এ আমল করলে কাফেররা কী মুমিনদের বন্ধু হবে নাকি শত্রু হবে? সব নবীদের জন্যে অপরাধীরা শত্রু ছিল। আর এখন যেহেতু নবী নেই; তাই নবীর কাজটা বাকি থাকবে। পৃথিবী কি কাফের-মুশরিক, ইয়াহুদী-নাসারার মতো অপরাধী থেকে শূন্য হয়েছে?

তাহলে নবীওয়ালা কাজের মধ্যে যে লেগে থাকবে, এই অপরাধীরা তার বন্ধু হবে নাকি শত্রু হবে? অবশ্যই শত্রু হবে। মুসলিম জামাতগুলোর মধ্য হতে মুজাহিদদের জামাতকেই সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করে কাফেরেরা, এটা বলে প্রকাশ করার কিছু নেই। তাহলে বুঝা গেল, মুজাহিদরাই সবচেয়ে বেশি নবীওয়ালা কাজের সাথে লেগে আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শুনেছেন, কাফেররা মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তিনি বসে ছিলেন না; বরং তিনি আল্লাহর নির্দেশে বেরিয়ে পড়েছেন। সেই রাসূল এখন থাকলে নিশ্চয়ই বেরিয়ে যেতেন।

কাফেরদের প্রতি কঠোর আর মুমিনদের প্রতি সদয় হওয়া সাহাবাদের নমুনা। আর এই গুণ প্রকাশ পাবে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার মাধ্যমে। সকল ফুকাহায়ে কেরাম একমত যে, মুসলিম যদি কোথাও আক্রান্ত হয়; তাহলে তাকে উদ্ধার করা সবার ওপর পর্যায়ক্রমে ফরজ হয়ে যায়।

আর ফরজে কেফায়া জিহাদ হচ্ছে কাফেরদেকে তাদের রাষ্ট্রে প্রতি বছর কমপক্ষে একবার আক্রমণ করা। বর্তমানে এই কাজটাও মুসলিমদের দ্বারা চলছে না। আর ফরজে কেফায়া যদি কারো দ্বারা আদায় না হয়; তাহলে সেই ফরজ সবার ওপর থেকে যায়। তাহলে আমাদের ওপর জিহাদের ফরজে আইন ও কেফায়া উভয়টিই বিদ্যমান আছে। আর বিষয়টি এমন যে, এর দ্বারা দ্বীন প্রতিষ্ঠা হবে এবং অনিষ্টতাও দূর হবে। সুতরাং তা পালন করা ছাড়া কি খারাপি দূর হবে? তারপর আল্লাহ বলছেন যে,

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ

"তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করবে না।" সুতরাং এই পথে তিরস্কার

আছে। নিজের লোকেরাই বিভিন্নভাবে নিন্দা করে, খোঁটা দেয়, গালি দেয়, তিরস্কার করে। এখন কেউ যদি এগুলোকে পরোয়া করে, তাহলে সে জিহাদের পথে অগ্রসর হতে পারবে না। বরং সব তিরস্কার উপেক্ষা করেই এই পথে হাঁটতে হবে। এ পর্যায়ে আমাদের নিকট এই বিষয়টা স্পষ্ট হলো, এই দুরবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে কিতাল করা জরুরী।

একটি উপমা এবং বাস্তবতা

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "সমাজের নেককার ও বদকারের দৃষ্টান্ত হলো, একটি জাহাজের ওপর তলায় ও নিচ তলায় অবস্থানরত কিছু লোকের ন্যায়। নিচের তলার লোকেরা ওপরের তলা থেকে কষ্ট করে পানি সংগ্রহ করতে হয়। তাই তারা নিজেদের এলাকায় একটা ছিদ্র করে নিচ্ছে। এখন ওপর তলার লোকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত যিকির, তাছবীহ, নফল নামাজ, জাহাজে রং লাগানো, লাইট ফিট করা ইত্যাদি কাজ করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ নাকি তাদেরকৃত ছিদ্র বন্ধ করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? যদি তারা এই কাজগুলো ঠিকই করলো কিন্তু ছিদ্র বন্ধ না করে; তাহলে তাদের এই কাজগুলো কোনো কাজে আসবে না। আর আল্লাহ তাআলা বলেন, প্রতিরোধ যদি না থাকে তাহলে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইউরোপ স্পেনের মতো দেশে আজ ইসলামের কিছুই নেই। অথচ তারা সব ইবাদাত পূর্ণভাবে আদায় করতো। বুখারা, সমরকন্দ এই সকল অঞ্চলে মাসজিদ-মাদরাসা ছিল। এখন কিছুই নেই। কেন এমন হলো? আসলে প্রতিরোধ না থাকলে, এমনই হয়ে যায়। জাহাজের ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করি, কেউ যদি ছিদ্র বন্ধ না করে, তাহলে অন্যান্য কাজগুলো কোনো উপকারে আসবে না। এর চেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে?

এবার যদি আমরা ভালোভাবে খেয়াল করি, তাহলে আমাদের সর্বাগ্রে করণীয় কাজটা এমনিতেই নির্ধারণ হয়ে যায়। তাহলে যারা বর্তমানে সমাজে নাফরমানিকে প্রতিষ্ঠিত করে রাখছে, তারা অবশ্যই শক্তির মাধ্যমে তা করছে। আর এটাকে প্রতিরোধ করতে হলে শক্তিই লাগবে। ছিদ্র বন্ধ করতে হলে যদি এই লোকগুলোকে মারতেও হয়, তাহলে তাদেরকে মারাটা উপকারী হবে। আর এদেরকে না মারলে তারাও মরবে, অন্যদেরকেও মারবে। আর এদেরকে মেরে ফেললে, এরা মরলো; কিন্তু অন্যরা সবাই বেঁচে গেল। ইসলামে জিহাদটা মূলতঃ এটাই। এখন এই বিষয়টাকে যদি ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়, তাহলে এর ওপর ধাক্কা আসছে।

হাদীসে আছে, "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসৎ কর্ম দেখে, তাহলে তা হাত দ্বারা ফিরাবে, তা না পারলে কথার দ্বারা , তাও না পারলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। শুধু ঘৃণা করবে না; বরং তা প্রতিরোধ করার পরিকল্পনা করবে।" যেমন, কারো মেয়েকে মাস্তানরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই কাজটা মুনকার কাজ। এই অবস্থায় সে কী করবে? নিশ্চয়ই হাত দ্বারা বাধা দিবে। ওদেরকে মেরে নিজের মেয়েকে রক্ষা করবে। আর যদি নাই পারে, তাহলে প্রশাসনের সহায়তা নিবে। এলাকার মানুষ ডাকবে। চিৎকার করবে। সে তাদেরকে এভাবে বলবে না যে, এই তোমরা যেই কাজটা করছো, তা অন্যায় হচ্ছে। অসাংবিধানিক হচ্ছে। আমি কালকে পত্রিকায় তোমাদের নামে রিপোর্ট করবো। এ কথা বলে সে ঘুমিয়ে থাকবে?

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আমরা এই কথা বলি যে, আলেমদের দায়িত্ব হলো, মুখ দিয়ে বাধা দেওয়া আর প্রশাসনের কাজ হলো, হাত দ্বারা বাধা দেওয়া। জনসাধারণের কাজ হলো, অন্তর দ্বারা ঘৃণা করা। দিনের ব্যাপারে এমনই কৌতুকপূর্ণ অবহেলিত ভাগ আমরা করে নিয়েছি। আর তোমার মেয়েকে যদি নিয়ে যেত, তাহলে তুমি কি করতে? সেই ক্ষেত্রে তুমি মুখটা এভাবে ব্যবহার করতে, আমার মেয়েকে নিয়ো না। তোমাদের বিরুদ্ধে পত্রিকায় রিপোর্ট করবো। হাতের দ্বারাও জিহাদ হয়ে যাবে, অন্তরের দ্বারাও হবে এবং কলম দ্বারাও হবে। কাজটা যথেষ্ট হয়েছে?

বরং এক্ষেত্রে পেরেশান হয়ে যেত। এই পেরেশানি যার মধ্যে নাই তার ঈমান দূর্বল। যার মাঝে অন্তর দ্বারা ফিরানোর ইচ্ছাও নেই, তারপর আর সরিষা পরিমাণ ঈমানও বাকি থাকে না। ঈমান থাকলে তার এই পেরেশানি আসবে না কেন? আমি আল্লাহর গোলাম, আর আমার সামনেই আমার রবের নাফরমানি হচ্ছে! আচ্ছা, যদি এমন হয় যে, আমার মনিবের সন্তানকে বাজারে মাস্তানরা মারছে আর আমার একটুও ব্যথা লাগছে না। আমি কোনো চেষ্টাই করিনি তাকে বাঁচানোর জন্যে। শুধু মনিবের মাল বিক্রি নিয়েই আমি ব্যস্ত থাকলাম, তাহলে সেই মুনিব আমাকে আর রাখবে? বরং আমাকে তো বাদই দিয়ে দিবে।

দুনিয়ার একজন গোলাম তার মুনিবের কাছ থেকে যত অনুগ্রহ পাচ্ছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমরা তার চেয়েও অনেক বেশি পাচ্ছি। মুমিনের জন্যে তার সন্তান যেমন প্রিয়, তার নিকট আল্লাহর দ্বীনটা কম প্রিয়? তাহলে আল্লাহর দ্বীনের ওপর আঘাত করা হচ্ছে, তাঁর বান্দাদেরকে অপমানিত করা হচ্ছে; এমতাবস্থায় মুনিবের বিভিন্ন মাল বিক্রি করা আমার জন্যে শোভনীয় নয়; বরং দ্বীনকে অপমান থেকে উদ্ধার করা আমার ওপর ফরজ। অতএব এই ফরজ কাজটা যার বুঝে আসে না, সে কতটুকু ভীরু পর্যায়ের? উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব যদি মুখ দ্বারা বলাও হয়, তাহলে কি পরিমাণ বলা উচিৎ? যদি আমার মেয়ে লাঞ্ছিত হয়, তাহলে আমার বলাটা কি পরিমাণ হতো?

সত্য সামান্য পরিমাণও কী গোপন করার অবকাশ আছে?

এখন দ্বীনের এই দুরবস্থায় মুসলমানকে উদ্ধার করার জন্যে আমার করণীয় কী? বেশি করে দুআ করা? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কাবা ঘরের গিলাফ ধরে দুআ করে সব কাফেরকে মেরে ফেলতে পারতেন না? কাবা ঘরে, আবার রাসূলের দুআ, আল্লাহ সবচেয়ে বেশি কবুল করবেন। আর রাসূলের ওপর আক্রমণকারী শত্রুর চেয়ে জঘন্য শত্রু আর কে আছে? সেই শত্রুর বিরুদ্ধে যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা ঘরে গিয়ে দুআ করেন, সেই শত্রু আর থাকবে না; আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

উহুদের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২টা বর্ম পরিধান করেছেন। তিনি উম্মাতকে আসবাব অবলম্বন করতে শিখিয়েছেন।

কাজ যেটা যেভাবে করার, সেটাকে সেভাবে করতে হবে। আল্লাহ বলেন, দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো। আল্লাহ এই কথা শুধু শুধু বলেননি। প্রত্যেকটা কাজ করতে হবে তার স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী। যেই ফলের জন্যে যেই গাছ দরকার, সেই ফলের জন্যে সেই গাছ লাগাতে হবে। কেউ যদি কলা গাছ রোপণ করে আমের আশায় বসে থাকে, তাহলে সে আম খেতে পারবে? আল্লাহ চাইলে তো পারেন; কিন্তু তিনি তো এই হুকুম দেননি।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে যদি শক্তি অর্জন করতে হয়, তবে তা করতে হবে। ওয়াজিব আদায় করার জন্যে যা প্রয়োজন, তা আদায় করাও ওয়াজিব। আমরা যারা আলেম; তাদের মুখে বলার শক্তিটুকু তো আছে। হক্ব কথা বললে সর্বোচ্চ নিন্দা, বাধা আসবে। এখন বাধা আসার ভয়ে যদি আমরা হক্ব কথা না বলি, তাহলে কি ইলমের দায়িত্ব আদায় হলো? যদি নাই হয়, তাহলে আমি তো ইলম গোপনকারী হয়ে গেলাম। সাধারণ মানুষ আলেমদের ব্যাপারে এই ধারণা করে যে, তারা আমাদেরকে সত্য কথা বলে। আর হক্ব কথা বলা আলেমদের ওপর ফরজ। রাসূলের জন্যে কোনো কিছু গোপন বা অস্পষ্ট রাখার অবকাশ ছিল না।

পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

"হে রাসূল! আপনার প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, আপনি তা পৌঁছে দিন। আর যদি আপনি না পৌঁছান; তাহলে আপনি আপনার রিসালাতের দায়িত্ব আদায় করেননি।" -সূরা মায়েদা: ৬৭

এই আয়াতের তাফসীরে জালালাইন এর মুসান্নিফ রহ. বলেন, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ রূপে পৌঁছান। যদি কিছু না পৌঁছান তাহলে আপনি আল্লাহর রিসালাত পৌঁছাতে পারেননি। তাহলে কিছু পৌঁছানো আর কিছু না পৌঁছিয়ে চুপ করে থাকা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিয়ম নয়। সুতরাং উলামায়ে কেরামের দায়িত্বও হলো, সুবিধা মতো হোক বা না হোক উভয় অবস্থাতেই পৌঁছানো।

যদি সুবিধাজনকগুলো পৌঁছিয়ে বাকিগুলো বাদ দেয়া হয়, তাহলে কুরআনের ঐ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে, কিছু মানুষ কিনারায় থেকে আল্লাহর ইবাদাত করে। যদি সে সুবিধা পায় তাহলে ঠিক থাকে। আর বিপদে পড়লে পিছন ফিরে যায়। এমন হলে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বের সুবিধাজনক অংশ পৌঁছালে আমাদের দায়িত্ব আদায় হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এমনি করতেন, তাহলে আরবের লোকদের সাথে তাঁর কোনো সংর্ঘষই হতো না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

"তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম আ. ও তাঁর অনুসারীদের মাঝে উত্তম আদর্শ আছে। যখন তিনি নিজ সম্প্রদায়কে বলেছেন, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করছো, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের (আকীদা-বিশ্বাস) অস্বীকার করি। আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।" -সূরা মুমতাহিনা: ৪

এ ধরনের স্পষ্ট বক্তব্যের ফলে হযরত ইব্রাহিম আ. এর ওপর বিপদাপদ এসেছে। তবুও তিনি পিছপা হননি। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে এটা স্বাভাবিক যে, সত্য বললে বাধা, নিন্দা আসবেই। আর এগুলোকে যদি কেউ মোকাবেলা করে যায়, তাহলে এর প্রত্যেকটা আখিরাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হবে। যে বিপদের ভয়ে সঠিক পথ ছেড়ে দেয়, সে তো পরীক্ষায় ফেল করল। আর এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

"মানুষ কি মনে করে 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে? " -সূরা আনকাবূত: ২

সুতরাং উলামায়ে কেরামের হক্ব কথা না বলে চুপ থাকার অবকাশ নেই। আর বিপদ আসলে সাহায্য আল্লাহই করবেন। যেই বিষয়টা দ্বারা দ্বীন প্রতিষ্ঠা হবে; তা বললে শাসক, সভাপতি, সমাজের কিছু লোক অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্যে সত্য বলা থেকে বিরত থাকা হলে, তাওহীদ মানা হলো না, আল্লাহকে লাভ ক্ষতির মালিক মানা হলো না; বরং অন্যকে মানা হলো। তখন তাওহীদ আর থাকবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

"নিশ্চয় যে সকল লোক আমার নাযিলকৃত স্পষ্ট নির্দেশনাবলী ও হেদায়েতকে গোপন করে, আমি তা মানুষের জন্যে কিতাবের মাঝে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করার পরেও। তাদের প্রতি আল্লাহ লা'নত করেন এবং সকল লা'নতকারী লা'নত করেন।" -সূরা বাকারা: ১৫৯

তাই আলেম হয়ে যদি আল্লাহ তাআলার বিধানাবলীকে স্পষ্ট না করা হয়, তাহলে লা'নতের খাতায় নাম লিখাতে হবে। এই লা'নত থেকে বাঁচার জন্যে দুনিয়ার বিপদ যতই বড় হোক, হক্ব কথা স্পষ্ট করে বলাই কর্তব্য। আর হক্ব কথা স্পষ্ট করতে থাকলে আল্লাহ তাআলা কিছু মানুষ এমন রেখেছেন, যারা তা মান্য করবে। যেমন কিছু জমিনে বৃষ্টি বর্ষণ হলেই, তাতে ফসল হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দিন। আমীন।

যুগে যুগে ‘উলামায়ে সূ’ এর অবস্থান

জামাল ইবরাহীম

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন মাজীদে দু’ধরনের গুণের কথা উল্লেখ করেছেন।

(ক) সিফাতে হাসানাহ [উত্তম গুণাবলী]

(খ) সিফাতে রাযেলাহ [নিকৃষ্ট গুণাবলী]

১. সিফাতে হাসানাহ

সিফাতে হাসানাহ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ

“সে সকল লোকেরও কোনো গুনাহ নেই; যারা এসেছে তোমার নিকট যেন তুমি তাদের বাহন দান করো এবং তুমি বলেছো, আমার কাছে এমন কোনো বাহন নেই যে, তার ওপর তোমাদের সওয়ার করাবো। তখন তারা ফিরে গেছে; অথচ তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল, এ দুঃখে যে, তারা এমন কোনো বস্তু পাচ্ছে না; যা ব্যয় করবে।” -সূরা তাওবা: ৯২

আমাদেরকে সর্বদা একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে, পবিত্র কুরআনে কোনো সিফাতে হাসানাহ উল্লেখ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলিমের ওপর প্রতিকূলতার ঝড় যতই বয়ে যাক; অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হলেও সিফাতটি অর্জন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

উপরোক্ত আয়াতটি কিছু আনসারী সাহাবীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। যারা তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে নিখাদ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সাওয়ারীর আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তিনি বললেন, আমার কাছে তো সাওয়ারী নেই। তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন।

এখানে আল্লাহ তাআলা সাহাবাদের সিফাতে হাসানাটি উল্লেখ করেছেন, শত প্রতিকূলতার মাঝে সর্বদা নিজকে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত রাখা। কোনো কারণবশতঃ জিহাদে শরিক হতে না পারলে পরিতাপ ও আফসোসের সহিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে কেঁদে কেঁদে দুআ করা।

কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলিম আসবে সকলে যেন এই সিফাতে হাসানাগুলো অর্জন করে, এ জন্যেই পবিত্র কুরআনে এই ধরনের সিফাতের আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরআনে বর্ণিত সকল সিফাতে হাসানাহ অর্জন করার তাওফীক দান করুন।

২. সিফাতে রাযেলাহ

কুরআনে বর্ণিত দ্বিতীয় প্রকার সিফাত হলো সিফাতে রাযেলাহ, এর বর্ণনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কিয়ামত পর্যন্ত যত উম্মাহ আসবে শত প্রতিকূলতার মাঝেও উহা থেকে বিরত থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। পবিত্র কুরআনে সিফাতে রাযেলাগুলো সাধারণত তিনটি প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

(ক) বংশ প্রসঙ্গে।

(খ) গোত্র প্রসঙ্গে।

(গ) কোনো সম্প্রদায়ের বিশেষ কিছু ব্যক্তি সম্পর্কে।

এ সিফাতে রাযেলাহগুলো ইয়াহুদী ‘উলামায়ে সূ’ এর ব্যাপারে। আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদী ‘উলামায়ে সূ’ এর ব্যাপারে অনেক সিফাতে রাযেলাহ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তিনটি,

(ক) **كتمان العلم** - জ্ঞান গোপন করা।

(খ) **ترك بعض الكتاب واخذ بعض الكتاب** - আসমানী কিতাবের কিছু অংশের ওপর আমল করা ও কিছু অংশ ছেড়ে দেয়া।

(গ) **تحريف الكتاب** - আসমানী কিতাব বিকৃতিকরণ।

ক - কিতমানুল ইলমের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

“নিশ্চয় যে সকল লোক আমার নাযিলকৃত স্পষ্ট নির্দেশনাবলী ও হেদায়েতকে গোপন করে, আমি তা মানুষের জন্যে কিতাবের মাঝে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করার পরেও। তাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেন এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণও অভিসম্পাত করেন।” -সূরা বাকারা: ১৫৯

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং সে জন্যে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ভরে না। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথাও বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না; বস্তুত তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।” -সূরা বাকারা: ১৭৪

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

“এরা সেই সব লোক, যারা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী এবং মাগফিরাতের পরিবর্তে আযাব ক্রয় করে নিয়েছে। সুতরাং (ভেবে দেখো) তারা জাহান্নামের আযাব ভোগ করার জন্যে কতটুকু প্রস্তুত!” -সূরা বাকারা: ১৭৫

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করছো? এবং জেনে শুনে কেন সত্য গোপন করছো?” -সূরা আলে ইমরান: ৭১

উপরোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল ইয়াহুদী ঐ সমস্ত ‘উলামায়ে সূ’ এর ব্যাপারে যারা তাদের কর্তৃত্ব চলে যাওয়া ও জনসাধারণ থেকে হাদিয়া-তোহফা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে হক্বকে গোপন করেছিল তথা তাওরাতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুণাবলী ও তাঁর পথনির্দেশনা অনুসরণ আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে জাতির সামনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা থেকে বিরত ছিল।

বোঝা গেল, যে বা যারা জেনে বুঝে এ সকল কাজ করে তারাই হলো ‘উলামায়ে সূ’। তাদের অবস্থান যেমন অতীতে ছিল, বর্তমানেও আছে, আর ভবিষ্যতেও থাকবে। কুরআনে তাদের আলামত উল্লেখ করার একমাত্র কারণ হলো, উম্মাহ এদেরকে চিহ্নিত করে নিজেদেরকে বাঁচাবে; তাদের খপ্পর থেকে নিজেকে হেফাজত করবে।

আপনারা জানেন, বর্তমান যুগে সব চাইতে কঠিন আমল হলো জিহাদের আমল। কারণ এ আমল করতে গেলে নামী-দামী মাদরাসা আর মাসজিদের কর্তৃত্ব চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যেমনিভাবে ইয়াহুদী ‘উলামায়ে সূ’রা তাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করতো, হাদিয়া-তোহফা বন্ধের আশঙ্কা, তাগুতের জিন্দানখানায় বন্দী হওয়ার ভয়।

পাঠক! যারা আজকে মাদরাসা-মাসজিদের কর্তৃত্ব চলে যাওয়ার আশঙ্কায়, হাদিয়া-তোহফা না আসার ভয়ে, তাগুতের জিন্দানখানায় বন্দী হয়ে যাওয়ার ভয়ে উম্মাহর ওপর ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কথা, জিহাদ প্রসঙ্গে, জিহাদের ফযীলত, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরছে না; তারাই এ যুগের ‘উলামায়ে সূ’।

আল্লাহর কিছু মুখলিস বান্দা জিহাদের ফরিযা আদায় করার কারণে যে সকল আলেম তাদেরকে জঙ্গিবাদী আখ্যা দিচ্ছে, তারা হলো এ যুগের ‘উলামায়ে সূ’। যে সমস্ত আলেম কিছু দ্বীনের খাঁটি আলেমদেরকে জিহাদে নিয়োজিত থাকার কারণে দ্বীন ধ্বংসকারী আখ্যা দিচ্ছে, তারা হলো এ যুগের ‘উলামায়ে সূ’। যে সমস্ত আলেম কিছু যুবকদেরকে, যারা নিজেদেরকে জিহাদের কাজে নিবেদিত করার কারণে তাদের জিহাদী বই পড়তে বাধা দিচ্ছে, এমনকি মাদরাসা থেকে বের করে দিচ্ছে; তারা হলো এ যুগের ‘উলামায়ে সূ’। এ সমস্ত ‘উলামায়ে সূ’র ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত আয়াতগুলোতে যে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন তা হলো,

১. يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

আতা রহ. বর্ণনা করেন, اللَّاعِنُونَ শব্দের ভাবার্থে সমস্ত জীব-জন্তু ও দানব-মানবকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সকল জীবই ‘উলামায়ে সূ’দের ওপর লানত বর্ষণ করতে থাকে।

২. أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ

এই সমস্ত ‘উলামায়ে সূ’ সত্যকে গোপন করে যা ভক্ষণ করে, তা আগুন ব্যতীত আর কিছুই নয়।

৩. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

এই সমস্ত ‘উলামায়ে সূ’দের সাথে আল্লাহ কোনো কথা বলবেন না। অর্থাৎ নম্রতা ও দয়া-মায়ার সাথে কোনো কথা বলবেন না।

৪. وَلَا يُزَكِّيهِمْ

এই সমস্ত ‘উলামায়ে সূ’কে আল্লাহ কিয়ামতের দিন পবিত্র করবেন না। যারা সাধারণ পাপ করবে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা শাস্তি ভোগের পর পবিত্র করে দিবেন; কিন্তু তিনি এ সকল কপাল পোড়া ‘উলামায়ে সূ’কে পবিত্র করবেন না।

৫. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

এদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৬. اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ

সত্যকে গোপন করার কারণে তারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহীকে ক্রয় করেছে।

৭. وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ

এ সমস্ত ‘উলামায়ে সূ’রা সত্যকে গোপন করে ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তিকে ক্রয় করে নিয়েছে।

কোনো আলেম যদি ইসলামের কোনো একটি বিধানকে গোপন করে, তাহলে সে উল্লিখিত ধমকির আওতাভুক্ত হবে। কেননা উল্লিখিত আযাবে যে ৮ ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি লফযে আম; যা ব্যাপকতা অর্থে আসে, এর থেকে কাউকে আলাদা করা বা নির্দিষ্ট করার সুযোগ নেই।

খ - সিফাতে রাযেলার দ্বিতীয় প্রকার হলো, শরীয়তের কিছু অংশ মানা ও কিছু অংশ না মানা। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ , فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا , وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ

“তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো আর কিছু অংশ অবিশ্বাস করো? যারা এরকম করে তাদের জন্যে দুনিয়াতে আছে লাঞ্ছনা। আর কিয়ামত দিবসে তারা ফিরে যাবে কঠিন আযাবের দিকে।” -সূরা বাকারা: ৮৫

আয়াতটি বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। যাদেরকে আল্লাহ তিনটি কাজের আদেশ দিয়েছিলেন,

১. খুনাখুনি করবে না।

২. কাউকে দেশান্তর করবে না।

৩. স্বগোত্রীয় কেউ কারো কাছে বন্দী হলে, তাদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করবে।

বনী ইসরাঈল তিনটি আদেশের মধ্যে শুধু তৃতীয় হুকুমটি মানতে-া। আল্লাহ তাআলা তাদের কিছু মানা কিছু না মানাকে সম্পূর্ণরূপে না মানার ন্যায় কুফুরী বলে সাব্যস্ত করেছেন। যারা শরীয়তের কিছু বিধান মানবে আর কিছু বিধান মানবে না; তাদের জন্যে দুনিয়াতে আছে শুধুই লাঞ্ছনা। আর কিয়ামতের দিন তারা নিক্ষিপ্ত হবে কঠিন শাস্তির দিকে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“হে রাসূল! আপনার ওপর যা কিছু নাযিল হয়েছে, তা আপনি পৌঁছে দিন। যদি আপনি তা না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। আর আল্লাহ তাআলা কাফেরদের পথ প্রদর্শন করেন না।” -সূরা মায়েদা: ৬৭

ইসলাম দিমুখি কোনো অবস্থাকেই কবুল করে না। যেমন কোনো ব্যক্তি নামাযের কোনো একটি রুকন ব্যতীত নামাজ আদায় করলে, সে নামাজ তরককারী বলে গণ্য হবে। সে জন্যেই উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তার রসূলকেও ছাড় দেন নি। আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন, রাসূলও যদি কিতাবের কোনো একটি বিধান না পৌঁছে দেন, তবে যেন তিনি রিসালাতের সম্পূর্ণদায়িত্বকেই আদায় করলেন না।

অতএব, কেউ যদি তার কষ্ট হওয়ার ভয়ে বা অন্য কোনো কারণে শরীয়তের কোনো একটি বিধানকে প্রচার না করে; তাহলে সে সম্পূর্ণ শরীয়তকে তরককারী বলে গণ্য হবে। যে সমস্ত মাদরাসায় শরীয়তের কিছু বিধান আদায় করা হয়, কিছু তরক করা হয়। কিছু বিধান আলোচনা করা হয়, কিছু আলোচনা করা হয় না। কিছু বিধান আদায় করতে উৎসাহ দেয়া হয়, কিছুর ক্ষেত্রে চুপ থাকা হয়। কখনো কখনো নিরুৎসাহিত করা হয়। আবার কখনো তো এ সকল বিষয়ের মুকাদ্দামাকেও নিষেধ করা হয়। এ সকল মাদরাসা শরয়ী মাদরাসা নয়; বরং এগুলো খাহেশাত পূর্ণ করার খানকা। আর এ সব মাদরাসা-মাসজিদ পরিচালনাকারীরা হলো, পরিপূর্ণ ইসলাম তরককারী ও এ যুগের ‘উলামায়ে সূ’।

গ - তৃতীয় সিফাতে রাযেলাহ হলো, তাহরীফুল কিতাব তথা কিতাবের বিধানকে বিকৃত করা। এ মর্মে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“হে মুসলমানগণ! তোমরা কি আশা করো যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহর বাণী শ্রবণ করতো; অতঃপর বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিতো এবং তারা তা অবগত ছিল।” -সূরা বাকারা: ৭৫

এ যুগে যে সমস্ত আলেমরা ইসলামের কিছু বিধানকে বিকৃত করে নতুন অর্থ দাঁড় করাতে চায়। অর্থাৎ যারা জিহাদের মূল অর্থকে পরিবর্তন করে গণতান্ত্রিক রাজনীতি, প্রচলিত তাবলীগকে জিহাদ বলে চালিয়ে দিতে চায়, শুধু নফসের জিহাদকেই জিহাদ বলে চালিয়ে দিতে চায়, তারাই হলো এ যুগের ‘উলামায়ে সূ’।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ সকল ‘উলামায়ে সূ’ থেকে বেঁচে থাকার এবং তাদেরকে প্রতিহত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

একজন সতর্ককারীর সতর্কবার্তা!!

জেনে রাখুন, এই গুলি, বারুদ একদিন আপনাদের দিকে ফিরে আসবে....

আবু উবাইদাহ আল-হাফিয

বোখারা-সমরকন্দ; যুগ যুগ ধরে দ্বীনী ইলমের এক অতুলনীয় মারকায হিসেবে বিবেচিত ছিলো। গোটা দুনিয়া ছিলো বোখারা-সমরকন্দের ছাত্র। কিন্তু আল্লাহর দ্বীনকে হিফাযত করার জন্য ইলমের পাশাপাশি জিহাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বোখারা-সমরকন্দের উলামা ও তুলাবায়ে কিরাম। শুরু হলো রাশিয়ান নাস্তিক্যবাদী কমিউনিস্ট আগ্রাসন। মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে গেলেন উম্মাহর অল্প সংখ্যক গোরাবা মুজাহিদ। কিন্তু বলশেভিক কমিউনিস্টদের আগ্রাসনের মোকাবেলায় অধিকাংশ আলেম চুপ করে থাকলেন। হাতেগোনা অল্পসংখ্যক আলেম মুজাহিদদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। আলেমগণ ভাবলেন, কমিউনিস্ট ত্বাগুতের মোকাবেলা করে পারা যাবে না, তারা অনেক শক্তিশালী ! আর তাই তারা তাদের মাদরাসা হিফাযত করার অজুহাতে জিহাদ-মুজাহিদদের থেকে দূরে অবস্থান করতে লাগলেন। এমনকি এক পর্যায়ে আলেমগণ মুজাহিদ তথা "জঙ্গীদের সাথে নেই", এটি প্রমাণ করার জন্য মুজাহিদদেরকে 'বাগী' বা বিদ্রোহী ফতওয়া দিলেন। এভাবেই বোখারা-সমরকন্দের আলেমদের সমর্থন নিয়ে মুজাহিদদের কোনঠাসা করেছিলো নাস্তিক্যবাদী কমিউনিস্ট ত্বাগুত বাহিনী। তারপরের ইতিহাস হয়তো সবারই জানা !

যেই আলেমগণ জিহাদের পক্ষে না দাঁড়িয়ে কমিউনিস্ট নাস্তিকদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন; কমিউনিস্ট সরকার সেই আলেমদেরকেও ছাড়েনি। পাইকারিহারে গণহত্যা করেছিলো আলেম ও সাধারণ মুসলিমদের। সকল মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। একসময়ের ইলমের মারকায বোখারা-সমরকন্দে যুগ যুগ ধরে কোনো আযান দেওয়া যায়নি। ইসলামের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে দিয়েছিলো নাস্তিক্যবাদী কমিউনিস্টরা।

২০১২ সালের আগস্ট মাসে মিসরের সিনাই উপদ্বীপ থেকে 'আনসারু বাইতিল-মাক্বদিস' নামক একটি মুজাহিদ গ্রুপ মুসলিমদের চিরশত্রু যায়নবাদী দখলদার ইসরায়েলে হামলার চেষ্টা করে কিন্তু বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় মিসরের মুরতাদ সেনাবাহিনী। মুজাহিদদের সাথে তুমুল লড়াইয়ে কয়েকডজন মিসরীয় মুরতাদ সেনা নিহত হয়। যদিও মিডিয়ায় প্রকাশ করা হয় ১৬ জন সৈন্য নিহতের কথা। তখন প্রেসিডেন্ট ছিলো মুসলিম ব্রাদারহুডের মুরসী! ঘটনার পর গর্জে উঠলেন মুরসি ! নিহত এই মুরতাদ সেনাদের শহীদ আখ্যা দিয়ে এর প্রতিশোধ নেওয়ার ঘোষণা দিলো মুরসি। অতঃপর মুরসি সরকারের নির্দেশে মুরতাদ সেনাবাহিনী সিনাইয়ে ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়ে মুজাহিদদের পাশাপাশি বহু সাধারণ নিরীহ মুসলিমকেও হত্যা করে।

মুরতাদ সেনাদের জন্য মুরসির সেসময়ের বক্তব্য আল-জাযিরার এই রিপোর্টে দেখুন... ।১

তারপর ! এই হামলার বছর গড়াতে না গড়াতেই ক্ষমতাচ্যুত হলো মুরসির নেতৃত্বে গঠিত মুসলিম ব্রাদারহুড সরকার। ক্ষমতায় আসীন হলো মিসরের মুরতাদ সেনাবাহিনী। সেই দেশপ্রেমিক শহীদ (!) হওয়া সেনাবাহিনীর সৈন্যরা মুসলিম ব্রাদারহুডের হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে প্রকাশ্যে গুলি করে পাইকারী হারে হত্যা করেছে।

যেই বন্দুক, অস্ত্র, গুলি দিয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন মুরসী, সেই বন্দুক, অস্ত্র, গুলি ফিরে এসেছিলো তার দলের নেতা-কর্মীদের দিকে। আপন মনে করা ত্বাগুত সেনাবাহিনী-ই ছোবল দিয়েছিলো মুরসী ও তার দলের কর্মীদেরকে। আর শত্রু মনে করা সেই মুজাহিদরাই আজও মিসরের ত্বাগুত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছেন। মুসলিমদের হত্যার বদলা নিয়ে যাচ্ছেন এবং নিতেই থাকবেন ইনশাআল্লাহ।

২০০৪ সালে এদেশে র‍্যাব নামক একটি খুনী বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হয়। তৎকালীন সরকারের শরীক বৃহৎ গণতান্ত্রিক ইসলামী দলটির নেতাকর্মীদের ভাষ্য অনুযায়ী, তাদের দলের নেতাদের পরামর্শে এই বাহিনীটি গঠন করা হয়েছিলো এবং তুলনামূলক ধার্মিক সৈনিকদেরকে নাকি র্যাবে স্থানান্তর করা হতো!! অতঃপর ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট মাসে জেএমবির বোমা হামলার পর ইসলামের নামে পরিচালিত রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে বৃহৎ গণতান্ত্রিক ইসলামী দলটি জেএমবি, হারাকাতুল জিহাদ এবং অন্যান্য জিহাদী তানযীমের সদস্যদের বিরুদ্ধে ত্বাগুত বাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিলো। জিহাদী সংগঠনগুলোর হাজারো সদস্যকে তারা ত্বাগুত বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। যারাই গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় কুফরের বিরুদ্ধে কথা বলতো, তারাই উক্ত বৃহৎ গণতান্ত্রিক ইসলামী দলটির নেতা-কর্মীদের আক্রোশের শিকার হতো, তাদের দ্বারা আক্রান্ত হতো। আমরা ছিলাম এসবের স্বাক্ষী এবং আক্রান্তও হয়েছি বহুবার।

বৃহৎ গণতান্ত্রিক ইসলামী দলটির একজন কেন্দ্রীয় নেতা ও প্রখ্যাত বক্তা এক মাহফিলে হারাকাতুল জিহাদকে 'কুতকুতুল জিহাদ' বলে বিদ্রুপ করেছিলো। শুধু তাই নয়, উক্ত বক্তা এসব জিহাদী দলের সদস্যদেরকে গরুর রশি দিয়ে বেঁধে পুলিশে দেওয়ার আহবান জানিয়েছিলো !!

২০০৯ সালে ধর্মনিপরেক্ষতাবাদী কুফরী দল আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর উক্ত বৃহৎ গণতান্ত্রিক ইসলামী দল ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের কী অবস্থা হয়েছে, তা আশা করি সবার-ই জানা। এই ত্বাগুত র‍্যাব-ই তাদের নেতা-কর্মীদের সবচেয়ে বেশি হত্যা ও নির্যাতন করেছে এবং এখনো করছে !!

মুসলিমদের বিরুদ্ধে ত্বাগুত বাহিনীকে সর্বাত্মক সহায়তার যথাযথ বিনিময় চুকিয়ে দিয়েছে এই মুরতাদ বাহিনী। এটিই পৃথিবীর ইতিহাস। এটিই হক্ব-বাতিলের ইতিহাসের পাঠ !

আমরা চিৎকার করে বলতাম, এমন একদিন আসবে, যেদিন উক্ত বৃহৎ গণতান্ত্রিক ইসলামী দলটির নেতাকর্মীরা আমাদের কাছে এসে বলবে, থাকলে একটা গ্রেনেড কিংবা বোমা দিন ! এদেরকে মেরে প্রয়োজনে আমরাও মরে যাবো !!!

একদম হুবহু এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিলো ! তারা অনুরূপ কথা আমাদের ভাইদেরকে বলেছেও !! সুবহানাল্লাহ !!!

তারা তাদের ঐতিহাসিক পাওনা পেয়ে গেছে এবং পাচ্ছে। ইসলামের শত্রুদের পক্ষাবলম্বনের ফলাফল যুগে যুগে এমনটি-ই

হয়েছে। তারা যে এসব থেকে খুব বেশি শিক্ষা নিয়েছে কিংবা ত্বাগুতকে পরিহার করে মুজাহিদদেরকে সমর্থন করবে, এমনটি মনে করার মতো যথেষ্ট কারণ ও পরিস্থিতি এখনো খুঁজে পাইনি ! দু'আ করি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কুফুরী গণতন্ত্রের পথ পরিহার করে দ্বীন কায়েমের একমাত্র পথ জিহাদকে বেছে নেওয়ার তাওফীক্ব দান করুন।

উল্লেখ্য জেএমবি ও হারাকাতুল জিহাদের কর্মপদ্ধতির সাথেও তানযীম আল-কায়েদার কর্মপদ্ধতির বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

.... আজ এদেশের আলেমদের বিরাট একটি অংশ 'আমভাবে জঙ্গিবাদ নাম দিয়ে জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। দরবারী আলেমদের দ্বারা জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লাখো আলিমের স্বাক্ষরিত ফতওয়া প্রচারিত হচ্ছে। আলেমরা প্রকাশ্যে ত্বাগুত বাহিনীগুলোর পক্ষে জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। কথিত জঙ্গিবাদ দমনের জন্য ইসলাম বিদ্বেষী ত্বাগুত সরকার ও বাহিনীগুলোকে সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছে !! মা'আযাল্লাহ !!

এই আলেমদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, তারা এই ত্বাগুত সরকারের সাথে মিলে 'জঙ্গি ইসলাম' নির্মূল করে 'শান্তিবাদী ও শুদ্ধ ইসলাম' বজায় রাখতে চায় !!

কোনো ধরণের সন্দেহ, সংশয় ও অস্পষ্টতা ব্যতিরেকে পরিষ্কার বাক্যে বলতে চাই, আজ যেই গুলি, বন্দুক, বারুদ জঙ্গিবাদী ইসলামের অনুসারীদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তাতে এই আলেমদের সমর্থন ও সহযোগিতা রয়েছে, এই গুলি, বন্দুক, বারুদ-ই একদিন ত্বাগুতের সহায়তা করা আলেমদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে।

কারণ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এই ত্বাগুতেরা তাদের শান্তিবাদী ইসলামকেও দুনিয়া থেকে নির্মূল করতে চায়। তারা জঙ্গি ইসলামকে নির্মূল করার জন্য সাময়িকভাবে 'শান্তিবাদী ইসলামে'র সহায়তা নিচ্ছে মাত্র।

তবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মতবাদের আলোকে 'বিশুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ' হতে পারলে হয়তো ভিন্ন কথা ! আশা করা যায়, হয়তো তেমনটি হবে না। আর না হলেই নেমে আসবে সেই খড়গ, যা বোখারা-সমরকন্দে আপতিত হয়েছিলো! যা আজ আমরা চিৎকার করে বলছি !!

তারা কী দেখছে না! ত্বাগুত সরকারের ঘনিষ্ঠ মিত্র মুনতাসির মামুন, শাহরিয়ার কবীর, আরাফাত, শ্যামল দত্ত, নাসিরুশ-শাইত্বন বাচ্চু সহ অন্যান্য নাস্তিক-মুরতাদগুলো কী বলছে!! এগুলোই হচ্ছে এই সেক্যুলার ত্বাগুত সরকারের হৃদয়ের কথা, যা তারা এখন হয়তো সমস্বরে বলছে না। জঙ্গিবাদী ইসলাম তথা জিহাদ ও মুজাহিদদেরকে দমন করার পর তারা শান্তিবাদী ইসলামের অনুসারীদের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিবে।

এটি বুঝার জন্য আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের রিসার্চ বিভাগ র‌্যান্ড কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত গবেষণা পত্র " Civil Democratic Islam " অর্থা 'সুশীল গণতান্ত্রিক ইসলাম' এর মাত্র ৪ পৃষ্ঠার 'সামারি' বা সারাংশটি পড়ার অনুরোধ করছি। র‌্যান্ড কর্পোরেশনের উক্ত গবেষণাপত্রের লিংক.... ।২

এই ভূমির আলেমরা বোখারা-সমরকন্দের পরিস্থিতির দিকে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে। তারা উম্মাহকে কুফফার-মুরতাদদের বিরামহীন ইসলাম বিদ্বেষী পরিকল্পনার ব্যাপারে জাতিকে সতর্ক করা দূরের কথা বরং তারা এই মুরতাদ সরকারের সাথে সুর মিলিয়ে জঙ্গি-ইসলাম তথা জিহাদ ও মুজাহিদদেরকে নির্মূলে সহযোগিতা করছে ! আর কুফফার-মুরতাদরা ক্রমেই কাফিরায়ন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত সফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমরা আমাদের দেহে এক ফোঁটা রক্ত অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত এই কাফিরায়ন প্রক্রিয়াকে বাঁধাগ্রস্ত করার এবং তা নির্মূল করে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর যমীনে দ্বীন কায়েম হোক কিংবা তার আগেই আমরা আমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করি অথবা ত্বাগুতের কারাগারে অবরুদ্ধ থাকি, যে অবস্থায়ই থাকি না কেনো, আমরা সফল হবো, যদি দ্বীনকে আঁকড়ে থাকতে পারি।

আমরা আমাদের দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে উম্মাহর বর্তমান প্রজন্মের কাছে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রাখবো ইনশাআল্লাহ। উম্মাহর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জানবে, কাদের কারণে দ্বীন কায়েমের পথ সঙ্কুচিত হয়েছিলো, কাদের মাধ্যমে ত্বাগুত ও কুফর ইসলামের বিরুদ্ধে শক্তি লাভ করেছিলো এবং তাদের কুফরের বৈধতা পেয়েছিলো। মুসলিম উম্মাহর বর্তমান প্রজন্ম ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে এসবের সাক্ষী প্রদান করবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা উম্মাহকে সতর্ক করে যাবো সম্ভাব্য সব ক্ষেত্রে, প্রকাশ্যে-গোপনে। আমরা ত্বাগুতের সাথে আল-বারা তথা সম্পর্কচ্ছেদ ও শত্রুতার ঘোষণা দিয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাওহীদে বিশ্বাসী না হবে। আমরা ত্বাগুতের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাবো, যতক্ষণ না সর্বত্র দ্বীন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হবে।

সুন্নাহ হচ্ছে, যারা সতর্কবার্তা শুনে সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণে মনোযোগী হয়, তারা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয় না। আর যারা সতর্কবার্তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, তারা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয় ও ধ্বংস হয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলামের শত্রুদের চক্রান্ত থেকে এবং ধ্বংস হওয়া থেকে হিফাযত করুন। আমীন

1- http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/08/201285234293471O2.html

2- http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1716.html

কিভাবে এ দুই শ্রেণীর পরিণাম সমান হবে?

রাশেদ মাহমুদ

কতক আলেমকে বছরের পর বছর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নির্মম নির্যাতন সয়ে যেতে হচ্ছে, তাঁদের জন্যে ফাঁসির মুহূর্তই ঘনিয়ে আসছে, অবশেষে লাশ হয়ে মিলছে তাঁদের কারামুক্তি! আবার কতক আলেম আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনারে আমন্ত্রিত হচ্ছে, তাদের হাতে পদক তুলে দেওয়া হচ্ছে, তাদের সম্মানার্থে নৈশ ভোজের আয়োজন চলছে!

কতক আলেমের সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে অনুসারীদের আপন গৃহ ছেড়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। আবার কতক আলেমের মতকে একটু সমর্থন দেয়াতেই নামী দামী পদ-পদবী মিলছে! অত্যাচার নিপীড়নে কারো আঙ্গুল ফুলে বিষফোঁড়া হয়ে আছে আর কারো মাল-দৌলতে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যাচ্ছে! সত্যিই শুনে বিস্মিত হওয়ার মতোই এক বিভাজন! অথচ এরা সবাই তো একই পাঠ্যক্রম শেষ করেই আলেম বা আল্লামা হয়েছেন! দুনিয়াতেই যদি অবস্থা আর ফলাফল প্রাপ্তিতে এমন ব্যবধান হয়; তাহলে আখিরাতে প্রকৃত পরিণামে ব্যবধান তো হবেই! তবে আমরা একটু বুঝার চেষ্টা করি– চূড়ান্ত ফলাফল দিবসে কাদের হবে হাস্যোজ্জ্বল চাহনি আর কাদের জন্যে অপেক্ষা করছে অনন্ত অসীম সময়ের দুর্ভোগ-গ্লানি?

প্রত্যেক আলেমকে ইলম অন্বেষণ করেই আলেম হতে হয়; তো ইলম অন্বেষণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মাঝে ভিন্নতার কারণে পরবর্তীতে তাদের কর্মপন্থায় বিস্তর ব্যবধান হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র হাদীস দ্বারা আমরা খুব সহজে দু'ধরনের ইলম অন্বেষণকারী নিরূপণ করতে পারবো।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ] عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির মৃত্যু এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, সে ইসলামকে জিন্দা করার উদ্দেশ্যে ইলম অন্বেষণে রয়েছে, জান্নাতে তার আর নবীগণের মাঝে মাত্র একটি স্তরের পার্থক্য থাকবে -অর্থাৎ জান্নাতে সে নবীগণের মর্যাদার কাছাকাছি মর্যাদায় অবস্থান করবে- ।" -দারেমী।

এ হাদীস থেকে ইলম অন্বেষণের একটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানতে পারি, তা হলো, ইসলামকে জিন্দা করা অর্থাৎ আল্লাহর জমিনে তাঁরই বিধান অনুযায়ী ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং যে সকল আলেম এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইলম শিখেছেন, তাঁদের কর্মপন্থা তাই হবে; যে পন্থায় প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলামি শাসনব্যবস্থা। আর তা যে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ, পবিত্র কুরআন-হাদীসের শত শত নুসূস আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র সীরাত, সাহাবায়ে কেরামের আলোকিত জীবনীই এর সাক্ষ্য প্রমাণ করে।

অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

«مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» يَعْنِي رِيحَهَا .

"যে ব্যক্তি এমন কোনো ইলম অর্জন করল, যার দ্বারা আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লা'র সন্তুষ্টি লাভ করা যায়; তা সে কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে অর্জন করল, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।" - আবু দাউদ: ৩৬৬৪

এ হাদীস থেকে ইলম অন্বেষণের আরেকটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জানতে পারি, তা হলো– পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্য। সুতরাং যে সকল আলেম দুনিয়ার মাল-দৌলত, ইজ্জত-সম্মান লাভের আশায় ইলম শিখেছে, তাদের অবস্থান যে দুনিয়াদার আর তাগুত শাসকগোষ্ঠীর পিছু পিছু হবে; তা কি বলার অপেক্ষা রাখে? আর যাদের অবস্থান হবে তাগুত শাসকগোষ্ঠীর পেছনে, তাদের ইলম কি ঐ তাগুত শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধাচরণ করবে কখনো?

বর্তমানে মাজলুম মুসলিম উম্মাহ সর্বদিক থেকে এক কঠিন অবমাননা-কর পরিস্থিতির সম্মুখীন; মুসলিমদের ভূমিতে এসে কুফফার সম্মিলিত জোট মুসলিমদের হত্যা করে চলছে। মুসলিমরা নিজেদের ভূমিতে থেকেও কাফেরদের কুফুরি আইনের অধীনে জীবন যাপন করতে হচ্ছে। মুসলিমদের ভূমিতে চেপে থাকা কাফেরদের এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী তাগুত শাসকবর্গ এক এক করে ইসলামি বিধানাবলী পশ্চাতে ছুড়ে নিজেরাই আইন রচনা করে রবের আসনে সমাসীন হওয়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে নিজেদের ঈমান বাঁচানোর লক্ষ্যে কতক আলেম জিহাদ ফরজে আইন বলছেন আর কতক আলেম এ সব কিছু প্রত্যক্ষ করার পরও জিহাদের শর্তই খুঁজে পাচ্ছেন না! কতক আলেম মাজলুম উম্মাহর রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে সত্যকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন, নিজের জান উৎসর্গ করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাগুতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হচ্ছেন আর কতক আলেম সেই তাগুতদেরই অবৈধ ক্ষমতার খুঁটি মজবুত করার জন্যে বিবৃতি, সভা-সেমিনার, আর নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ঝুলির মোড়ক উন্মোচন করে যাচ্ছে। হে বিবেক! কিভাবে এ দুই শ্রেণীর পরিণাম সমান হবে?

উলামায়ে কেরামগণের সাথে শায়খ উসামা রহ. এর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক

অনেকে মুজাহিদদের সম্পর্কে এই অপবাদ দিয়ে থাকেন, তারা আলেমদের যথাযথ সম্মান করে না, আলেমদের মর্যাদা সম্পর্কে জানে না। আমি আলেমদের সাথে শায়খ উসামা রহ. এর অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে এ বিষয়টা স্পষ্ট করে দিতে চাই। তিনি যৌবনের শুরু থেকেই দ্বীনি শিক্ষার পাবন্দী করে আসছেন। ইলম অন্বেষণের জন্যে বহু মাশায়েখের ইলমি মজলিসে অংশগ্রহণ করতেন। আর যেহেতু শায়খ রহ. বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায়ই জিহাদের জন্যে বের হয়ে যান। এ কারণে, ইলম অর্জনে পুরোপুরি সময় দিতে পারেন নি; কেননা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহতে তিনি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন, এটিই ছিল তাঁর সর্বক্ষণের কাজ। কিন্তু এই ব্যস্ততাও শায়খকে ইলম অন্বেষণ এবং এর প্রচার-প্রসার থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

এখন আমি আলোচনা করবো উলামায়ে কেরামগণের সাথে শায়খ উসামা রহ. এর সম্পর্কের কথা। উলামায়ে কেরামগণের সাথে শায়খের কিছু সাক্ষাৎকারে আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। কিছু সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে স্বয়ং শায়খ আমার কাছে বলেছেন। আমার স্মরণ আছে, শায়খ আমাকে বলেছিলেন জাযিরাতুল আরবের আলেমদের সাথে সাক্ষাতের কথাও। শায়খ রহ. তাঁদেরকে জিহাদে বের হওয়ার এবং জিহাদের জন্যে প্রস্তুতি ফরয হওয়ার মাসআলা মানুষকে জানানোর ওপর উৎসাহ দিয়েছিলেন; কেননা উম্মাহর ধ্বংসই এখন শত্রুদের মূল টার্গেট। শত্রুরা চারদিক থেকে উম্মাহকে ঘিরে ধরেছে। ইসলামের ভূখন্ডগুলোর ওপর কবজা করেছে। আর স্পেনের পরাজয়ের পর থেকেই উম্মাহর ওপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে আছে।

এই সকল বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে শায়খ আলেমদের উদ্দেশ্যে বলতেন, তাঁরা যেন এ সম্পর্কে স্পষ্ট ফতওয়া প্রদান করেন। এই বিষয়ে শায়খ রহ. তাঁর সাথে মুহাম্মাদ ইবনে উসাইমিন রহ. এর সাক্ষাতের কথাও আমাকে বলেছেন। এটাও এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, শায়খ উসাইমিন শায়খ উসামা বিন লাদেনকে বিশেষ তাযকিয়াও প্রদান করেন; যা অনেকেরই জানা আছে। যাই হোক, শায়খ আমাকে বললেন, আমি শায়খ উসাইমিনকে অনুরোধ করলাম, "আলেমদের কাউন্সিল থেকে এই ফতওয়া প্রদান করা জরুরী যে, জিহাদের জন্যে বের হওয়া মুসলমানদের ওপর ফরয।" এরপর শায়খ উসাইমিন রহ. স্পষ্টভাবেই তাঁকে এ কথা বলেছিলেন, আমরা উলামা কাউন্সিল থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ফতওয়া দিতে পারি না; যতক্ষণ না আমরা ওপর থেকে অনুমতি পাই। অর্থাৎ বাদশাহ্'র কাছ থেকে। এরপর শায়খ রহ. বিষয়টি বুঝে নিলেন।

এমনিভাবে উলামায়ে সাহওয়াহর সাথে শায়খ রহ. এর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তারা ঐ সকল যুবক আলেম; যারা সাহওয়া ইসলামিয়া'র আন্দোলনকে জাযিরাতুল আরবে মেহনত করেন। শায়খ উসামা রহ. এদের নিয়ে অনেক আশা পোষণ করতেন। বিশেষ করে খালিজের প্রথম যুদ্ধের পর। শায়খ তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করার জন্যে বলতেন। তিনি তাদেরকে বলতেন, দাওয়াত ও জিহাদের জন্যে হিজরত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এটা নবীগণ, সালেহীন ও তাঁদের অনুসারীদের সুন্নতও বটে। শায়খ তাঁদেরকে বলতেন, সরকার আপনাদের ছাড়বে না, তারা অবশ্যই আপনাদের রুখে দিবে; শক্তি বলে আপনাদের মুখ বন্ধ করে দিবে।

এই জন্যে আপনাদের ওপর আবশ্যক হচ্ছে, আপনাদের মাঝ থেকে কিছু আলেমকে হিজরতের জন্যে প্রস্তুত করবেন। যখন দেশের অভ্যন্তরে আপনাদের ওপর জোর-জবরদস্তি করা হবে, তখন বাহির থেকে তো এমন কেউ থাকা দরকার; যারা আপনাদের পক্ষ হয়ে কথা বলবে। শায়খ বলতেন, আমি তাদের ওপর অনেক মেহনত করেছি। আমার এখনো শায়খের ঐ কথা মনে আছে, তিনি বলেছেন, জাযিরাতুল আরবের এমন কোনো আলেম নেই, যাকে আমি হিজরতের দাওয়াত দিইনি। চাই আপনারা তাকে চিনেন অথবা না চিনেন। উত্তরে তারা বিভিন্ন ধরনের ওযর পেশ করতেন। তারপরও শায়খ তাদেরকে নিজের দূরদৃষ্টি দ্বারা সাবধান করতে থাকেন। আর বাস্তবেও তাই ঘটেছে; যে রকম শায়খ বলেছিলেন।

তিনি এই সকল আলেমকে বলেছিলেন, অচিরেই আপনাদেরকে বেধে রাখা হবে। আপনাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে। আর আপনাদেরকে বন্দী করা হবে। তাদের থেকে একজন বলে উঠলেন, হে উসামা! যদি আমাদের ওপর ভেতর থেকে কোনো বিপদ এসে যায়; তবে বাহির থেকে আমাদের পক্ষে বলার জন্যে আপনি তো আছেনই। আর যখন কার্যত শায়খের দূরদৃষ্টি যেমন ছিল, তেমনি হলো। আপনারা সকলেই তা অবগত আছেন, কীভাবে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে! কীভাবে তাদের ওপর জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে! এ সময়েও শায়খ তাদের নাম শুনে তাদের সম্পর্কে বলতেন এবং তাদের ওপর আপতিত নির্যাতনের কথা আলোচনা করতেন।

এরপর সরকার তাদেরকে ছাড়তে শুরু করে। আমার স্মরণ আছে, যখন আমি জানতে পারলাম, তাঁদের একজন প্রসিদ্ধ আলেমকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তখন আমি শায়খের কাছে তার কথা বললাম। কিন্তু শায়খ আমার আগেই এ বিষয়ে আরো সবিস্তারে জানতেন। আমি খুশি খুশি শায়খের সামনে আসলাম। তাঁকে বললাম, আলহামদু লিল্লাহ! অমুক শায়খকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। ইনশাআল্লাহ, ওনার থেকে অনেক কল্যাণের আশা করা যায়। শায়খ প্রথমে চুপ ছিলেন। তারপর আমাকে বললেন, আসলে আপনি একটি কথা জানেন না। আমি বললাম, আল্লাহ আমাদের ভালো করুন। কী হয়েছে? শায়খ বললেন, এই লোকটি সম্পর্কে আমি যুবক ভাইদের সামনে কথা বলতে চাচ্ছিলাম না। আমি বললাম, কোনো সমস্যা নেই।

পরে শায়খ বলেছিলেন, ওই ব্যক্তিকে সরকার নিজের পক্ষের বানিয়ে নিয়েছে। আর সে যখন বের হলো, তখন মুহাম্মাদ নায়েফের প্রশংসা করতে করতে বের হয়। আমি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়লাম। শায়খ বলতে থাকলেন, আপনার কী জানা নেই, জেলের মধ্যে কী হয়? সরকার জেলকে সুসজ্জিত করে রেখেছে। আরাম-আয়েশের জায়গা বানিয়ে দিয়েছে। যার ফলে, এ রকম অনেক লোক বদলে গেছে। আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়লাম। শায়খ বললেন, হ্যাঁ, এ রকমই!

আর অধিক আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে, এ ধরনেরই একজন ব্যক্তি; যিনি নিয়মিত টেলিভিশনের প্রোগ্রামে উপস্থিত হয়ে থাকেন। একটি প্রোগ্রামে শেষ পর্যন্ত সে এটাও বলেছে, "আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে উসামা বিন লাদেন থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি।" আমি অস্থির হয়ে বললাম, সুবহানাল্লাহ! এটা কী রকম কথা! আমার কাছে এর চেয়ে অধিক কী সম্বল আছে যে, আমি আল্লাহর কাছে এই দুআ করবো, তিনি আপনাকে উত্তমভাবে সত্যে প্রত্যাবর্তন করাক। আর আপনার এমন শাহাদাত ভাগ্যে জোটুক, যেমন শাহাদাত আল্লাহ উসামা বিন লাদেনকে দিয়েছিলেন।

এমনিভাবে নিজেকে দায়ী দাবীকারী আরেক ব্যক্তি টেলিভিশনের পর্দায় এসে বলতে লাগলো, উসামা বিন লাদেন একেবারেই পথভ্রষ্ট একজন মানুষ। আর শায়খকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলো, তুমি সঠিকপথ থেকে অনেক দূরে! আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! উসামা বিন লাদেন তো গোমরাহ! আর হুসনে মোবারাক ও আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয হলো আমীরুল মু'মিনীন! কতই না নিকৃষ্ট বিচার তাদের! আমি তাদেরকেও এ কথা বলবো, হে আমার ভাই! আল্লাহ আপনাকে উত্তমভাবে সত্যের পথে প্রত্যাবর্তন করাক। আর আপনার ভাগ্যে জোটুক, ঐ রকম শাহাদাত; যেমন শাহাদাত আল্লাহ উসামা বিন লাদেন অথবা আবু দুজানা খুরাসানীকে দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা সকল শহীদদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

শায়খ উসামার সাথে আফগানিস্তানের আলেমগণ, বিশেষ করে মুজাহিদ আলেমদের সাথে মজবুত সম্পর্ক ছিল। আফগানিস্তানে আল্লাহ তাআলার অন্যতম একটি নিদর্শন হচ্ছে, সেখানে অনেক আলেম রয়েছেন; বিশেষ করে মুজাহিদ আলেম। যখন আফগান আলেমদের সাথে শায়খ রহ. এর সম্পর্কের কথা আসবে, তখনই শায়খ ইউনুস খালিসের কথা অবশ্যই আসবে। যিনি আলেমও ছিলেন; ছিলেন একজন মুজাহিদও। শায়খ ইউনুস খালিসের সাথে শায়খ উসামা বিন লাদেনের সম্পর্ক অনেক দিনের। যখন সুদানের সরকার শায়খ উসামা বিন লাদেনকে সুদান ছেড়ে যেতে বলল, তখন ইউনুস খালিস রহ. তাঁকে জালালাবাদে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁকে তাঁর প্রাপ্য প্রতিদান দান করুন। শায়খ ইউনুস খালিস উসামা বিন লাদেনকে অভ্যর্থনা জানান অত্যন্ত মর্যাদার সাথে এবং তাঁর অনেক খেদমত করেন।

শায়খ উসামা রহ.আমাদের বলেছেন, একবার পাকিস্তানে ইউনুস খালিসের কাছে সৌদি দূত এসেছিল। সে বলল, আপনি উসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন! আর আপনার কী জানা নেই, সে কত ভয়ঙ্কর মানুষ! সে রাষ্ট্রদ্রোহিতায় লিপ্ত। এ রকম আরো কথাবার্তা বলে তাঁর কান ঝালাপালা করে দেয় ঐ সৌদি দূত। শায়খ ইউনুস খালিস দূতের কথার জবাবে বলেন, "হে আমার ভাই! যদি হারামাইনের ভূমি থেকে একটা জানোয়ারও আমাদের কাছে আসে; তবে আমরা তাকেও আশ্রয় দিতাম। তো এটা কীভাবে সম্ভব যে, আমরা মুজাহিদদের আশ্রয় দেবো না?" তাঁর এই দাঁতভাঙা জবাবের পর সে খালি হাতে নাকাম হয়ে ফিরে যায়। শায়খ ইউনুস খালিস এর সাথে শায়খ উসামা বিন লাদেন এর উত্তম আচরণ সর্বদাই অটুট ছিল। তিনি সব সময় শায়খকে উত্তম নছিহত করতেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের ওপর, সমস্ত মুসলিমদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

আর এমনিভাবে শায়খ উসামা রহ. এর সাথে সম্পৃক্ত মুজাহিদীন আলেমদের মধ্যে একজন হলেন 'শায়খ জালালুদ্দীন হক্কানী'। তাঁর সাথেও শায়খের সম্পর্ক অনেক দিনের, জিহাদের প্রাথমিক সময় থেকে। শায়খ তাঁর সাথে খোস্ত বিজয়, কাবুল বিজয়, জাওয়ারের যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতেও শরিক ছিলেন। পরে যখন আমাদের ভাই মুস্তফা আবুল ইয়াজীদ শহীদ হলেন। তখন শায়খ জালালুদ্দীন হক্কানী শায়খ উসামা বিন লাদেন ও আমার নামে চিঠি প্রেরণ করেন। আর শায়খ উসামাকে উদ্দেশ্য করে এভাবে বলেন, "আমার প্রিয়তম মুজাহিদ ভাই উসামা বিন লাদেনের নিকট। আল্লাহ তাআলা শায়খ উসামাকে আপন রহমতের চাদরে ঢেকে রাখুন।"

এমনিভাবে আফগানিস্তানের যে সকল আলেমের সাথে শায়খের সম্পর্ক ছিল; তাঁদের একজন 'মৌলভী আব্দুল্লাহ জাকিরী'। তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তেমন পরিচিত নন; তবে আফগানিস্তানে সুপরিচিত ছিলেন। মানুষের হৃদয়ে তাঁর প্রতি অনেক সম্মান ছিল। শায়খ উসামা বিন লাদেন অধিকাংশ সময় তাঁর কাছে যেতেন। একবার আমিও তাঁর সাথে গেলাম। শায়খ তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ ও নছিহত চাইতেন। আর শায়খ আব্দুল্লাহ জাকিরীও কোনোরূপ কার্পণ্য করতেন না। শায়খ তো ছিলেন অনেক হিম্মতের অধিকারী। জাযিরাতুল আরবে খ্রিস্টানদের অবরোধের বিরুদ্ধে বয়ান দিয়েছিলেন। আর সেখানে অনেক আলে-মর স্বাক্ষর ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর মঙ্গল করুন। তাঁকে ইহকাল ও পরকালে আপন রহমতের ছায়ায় রাখুন।

এমনিভাবে শায়খের সাথে আলেমদের সম্পর্কের কথা আসলে যার কথা মনে পড়ে যায়, তিনি হলেন 'শায়খ ইয়াসির রহ.'। আল্লাহ তাঁর ওপর অগণিত রহমত বর্ষণ করুন। আমি ব্যাপকভাবে সকল মুসলমানের কাছে, আর বিশেষ করে শায়খ ইয়াসিরের পরিবারের কাছে শায়খের মৃত্যুতে শোক জানাচ্ছি। শায়খ ইয়াসির রহ. পাকিস্তানের গোয়েন্দাদের কাছে বন্দী ছিলেন। আর এভাবে এক সময় তাঁর মৃত্যুর খবর আসে। যদিও পাকিস্তানি এজেন্সীর পুরো জোর প্রচেষ্টা ছিল যেন এই খবর বাহিরে না যায়। কিন্তু তারপরও এই খবরটি প্রকাশ হয়ে যায়। এখনও জানা যায়নি, তাঁর মৃত্যুর আসল কারণ; কীভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে? তাঁকে কী এমনি ফেলে রাখা হয়েছে নাকি তাঁর চিকিৎসার প্রতি খেয়াল রাখা হয়নি? যা কিছু তারা করে, অচিরেই তা সকলে জেনে যাবে।

কিন্তু এটা পাকিস্তানিদের জন্যে একটা কালো অধ্যায়। পাকিস্তানি সরকার আর তার এজেন্সীগুলো যা কিছু করেছে, তা এমন বিশ্বাসঘাতকতা, যার দৃষ্টান্ত মুসলমানদের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। তারা এই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল অল্প কিছু পয়সার জন্যে। আল্লাহর হুকুমে এ সকল টাকা-পয়সা তাদের জন্যে কাল হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ মুফসিদীনের আমল সংরক্ষণ করেন না। যেমন আল্লাহর বাণী, "সামনে তারা আরো খরচ করতে থাকবে; কিন্তু তা তাদের জন্যে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তারা পরাজিত হবে। আর যারা কুফুরী করেছে, তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।" শায়খ ইয়াসির রহ. পাকিস্তানের জেলে শহীদ হোন। মূলতঃ পাকিস্তানের জেলে যে রকম ন্যক্কারজনক কাজ হয়; তা বাচ্চাদেরকে বুড়ো করে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

যাই হোক, শায়খ ইয়াসির রহ. ছিলেন শায়খের অন্তরঙ্গদের মধ্যে অন্যতম। আর তাঁদের এই সম্পর্ক রুশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় থেকে চলে আসছিল। তিনি ছিলেন আফগানিস্তানের প্রথম পর্যায়ের মুজাহিদ নেতাদের একজন। তিনি কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। যখন জিহাদ শুরু হলো, পাকিস্তানে হিজরত করেছিলেন। আর জামিয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় উযীরে তা'লীম

ছিলেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন মুজাহিদদের কাতারে। যখন 'ইমারাতে ইসলামিয়া'র শাসন প্রতিষ্ঠা হলো। তিনি তাঁদের সাহায্যকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। আর যখন আফগানে খ্রিস্টান হামলার আলামত দেখা যাচ্ছিল, তখন তিনি বৃদ্ধাবস্থার কাছাকাছি; বয়স হয়েছিল, প্রায় পঞ্চাশ বছর।

তোরাবোরার চড়াই-উৎরাই ফেরিয়ে তিনি আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন। শায়খ উসামার সাথে বসেছিলেন অনেকক্ষণ। শায়খ উসামা রহ. তাঁকে অনেক নছিহত করেন। শায়খ উসামাকে আল্লাহ তাআলা জিহাদের কারণে অনেক দূরদৃষ্টি দান করেছিলেন। শায়খ তাঁকে বললেন, এই অবস্থায় আপনি আপনার প্রচেষ্টা মিডিয়ার কাজে লাগান; কেননা আল্লাহ তাআলা আপনাকে ইলমে দ্বীন ও দাওয়াতের ধরন সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন। অতএব আপনি মিডিয়ার ক্ষেত্রে অগ্রসর হোন। এরপর শায়খ মুহাম্মাদ ইয়াসির রহ. টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দেয়া শুরু করেন। পরবর্তীতে যখন আমেরিকা আফগানিস্তানে প্রবেশ করল, তিনি তাঁর হিজরতের স্থল পাকিস্তান থেকে মিডিয়ার কাজে বিরাট ভূমিকা রাখেন। যারা আফগানিস্তানের খবর রাখেন, আল-জাযিরাতে দেয়া শায়খ ইয়াসির রহ. এর সাক্ষাৎকারের কথা নিশ্চয়ই তাদের স্মরণ আছে।

আর যারা শায়খকে গোপনে থাকার, চুপ থাকার পরামর্শ দিতেন। শায়খ তাদেরকে বলতেন, আমার জীবনের সম্পর্ক এই মিডিয়ার কাজে শহীদ হওয়ার প্রতিই। আমি নিজেকে উৎসর্গ মনে করি; কেননা আমি আর কাউকে দেখছি না যে, এ দায়িত্ব পালন করবে; এ কাজ সামলাবে। যদি এ কাজে থাকা অবস্থায় আমাকে শহীদ করে দেয়া হয় অথবা বন্দী করে ফেলা হয়; তো আমার জন্যে এটিই ফিদায়ী কাজ। তাঁকে প্রথমে কাবুলে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাঁকে বন্দী বিনিময়ের চুক্তিতে মুক্ত করা হয়। মুক্তির পর সাথে সাথে তিনি দাওয়াতের ময়দান সামলে নিলেন। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মা-বোনেরা তাঁর দাওয়াতের কাজকে সাদরে গ্রহণ করে নেয়। এরপর তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। আল্লাহর কাছে চাওয়া তিনি যেন আপনার ওপর রহম করেন। আর আমাদেরকে জান্নাতে একত্রিত করেন।

এমনিভাবে শায়খ উসামা রহ. এর সাথে পাকিস্তানের আলেমদের সম্পর্ক ছিল খুবই গভীর। আমি প্রথমেই বলেছিলাম, তিনি যখন কান্দাহারে ছিলেন, তাঁর কাছে পাকিস্তান থেকে আলেমদের অনেক প্রতিনিধি দল আসতো। এ সব নামের মাঝে একটি উজ্জ্বল নাম হলো 'মুফতী নিযামুদ্দীন শামযাঈ রহ.'। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের অত্যন্ত বিখ্যাত একজন আলেম। তিনিও শায়খ উসামার অন্তরঙ্গ মুহিব্বীনদের মাঝে অন্যতম। তিনি যখনই আফগানিস্তানে আসতেন, শায়খ উসামার সাথে অবশ্যই সাক্ষাত করতেন। বিভিন্ন বিষয়ে শলা-পরামর্শ করতেন। কান্দাহারে শায়খ উসামা বিন লাদেনের সাথে শেষ সাক্ষাতের সময় তাঁর সাথে তাঁর কিছু সঙ্গী-সাথীও ছিল। তাঁরা আফগানিস্তান সফরে এসেছিলেন। মাওলানা শামযাঈ তাঁদেরকে উসামা বিন লাদেনের কাছে নিয়ে গেলেন। আর তাঁকে বললেন, এই ভাইদেরকে পথ দেখান। তাঁদেরকে জিহাদের কাজ করার জন্যে উৎসাহ দিন।

শায়খ নিযামুদ্দীন শামযাঈ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি ভুলে গেছি। এক সাক্ষাতের সময় শায়খ উসামা বিন লাদেন শায়খ নিযামুদ্দীন শামযাঈকে মুসলিম উম্মাহর ওপর পশ্চিমা খ্রিস্টানদের জুলুম-সীমালঙ্গনের ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে বললেন। এ বিষয়ে শায়খ উসামা একটি বড় নকশা এঁকে রেখেছিলেন। আর শায়খ আবু হাফস রহ. ইসলামি বিশ্বের ওপর খ্রিস্টানদের দখলদারিত্বের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলছিলেন, কীভাবে পশ্চিমারা নিজেদের সৈনিক বলে? যারা ষড়যন্ত্রের বলে মুসলিমদের ঘিরে আছে! কীভাবে তারা জল-স্থলে কবজা করে আছে!

এই আলোচনা শায়খ শামযাঈর ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। পরে যখন তিনি পাকিস্তান ফিরে আসেন। তখন তিনি একটি হোটেলে এই ধরনের একটি প্রোগ্রামের আয়োজন করেন। আর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে ইসলামি বিশ্বের একটি মানচিত্র দ্বারা এই বিষয়টি স্পষ্ট করেন। পরে যখন তিনি দ্বিতীয়বার শায়খ উসামার সাথে মিলিত হোন। তিনি শায়খকে জানালেন, ইসলামাবাদে একই লেকচার দিয়ে এসেছেন; যা শায়খ উসামা রহ. তাঁকে বলেছিলেন।

যখন আফগানিস্তানে আমেরিকা হামলা করল। আর এতে আজকের আবু রিগাল বিশ্বাসঘাতক পারভেজ মোশাররফ আফগানিস্তানে আমেরিকার কবজার জন্যে সর্বদিক থেকে সাহায্য করে। শায়খ নিযামুদ্দীন শামযাঈ রহ. এর বিরুদ্ধে তাঁর বিখ্যাত ফতওয়া জারি করেন, ''যে শাসকই মুসলিম ভূমি দখল করতে কোনো কাফেরকে সাহায্য করে, তার ওপর থেকে শরীয়তের নিরাপত্তা রহিত হয় এবং তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।" এ ফতওয়া দেয়ার কিছু সময়ের মধ্যে শায়খ নিযামুদ্দীন শামযাঈ রহ. কে করাচিতে একটি এনকাউন্টারে শহীদ করে দেয়া হয়। আর হত্যাকারী পলায়ন করে। উসামা রহ. তাঁর একটি বইয়ে নিজের মনের কথা বলেন, "নিযামুদ্দীন শামযাঈকে হত্যা করার কারণ হলো, মোশাররফের বিরুদ্ধে দেয়া তাঁর প্রচারিত ফতওয়াটি।" আল্লাহ তাআলা তাঁদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। আর আমাদেরকেও তাঁদের সাথে জান্নাতুল ফিরদাউসের উঁচু মাকামে একত্রিত করুন, আমীন!

এমনিভাবে পাকিস্তানের আলেমদের মধ্যে যাদের সাথে উসামা রহ. এর সম্পর্ক ছিল; তাঁদের মাঝে একজন হলেন 'শায়খ আব্দুল্লাহ গাজী রহ.।' যিনি ছিলেন শহীদে লাল মাসজিদ আব্দুর রশীদ রহ. এর সম্মানিত পিতা। শহীদ আব্দুর রশীদ রহ. এর পরম সৌভাগ্য, তাঁর পরিবারে শুধু তিনি একা শহীদ নন; বরং তিনি শহীদ বাবা ও শহীদ মায়ের সন্তান । আল্লাহ তাআলা সকলের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

শায়খ আব্দুল্লাহ গাজী তাঁর মাদরাসার উসতায ও সঙ্গীদের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে কান্দাহারে আমাদের সাথে সাক্ষাত করতে আসেন; আর তাঁর সাথে শহীদে লাল মাসজিদ আব্দুর রশীদ গাজীও ছিলেন। তাঁরা আমাদের সাথে পুরো একদিন কাটান। শায়খ আব্দুল্লাহ গাজীর সাথে এ সাক্ষাৎকার খুবই সুখময় ছিল। শায়খ উসামা রহ. তাঁর সাথে বিস্তারিত কথাবার্তা বলেন। আর তাঁকে বললেন, তিনি যেন পাকিস্তানের আলেমদেরকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেন, যেন তাঁরা মুসলমান এলাকায় বিশেষ করে হারামাইনের ভূমিতে খ্রিস্টানদের হামলার বিরুদ্ধে ফতওয়া প্রদান করেন। শায়খ আব্দুল্লাহ গাজী শায়খ উসামার কাছে ওয়াদা করেন, ইনশাআল্লাহ, যখন তিনি ফিরে যাবেন, তখন এ বিষয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। আলেমদের থেকে ফতওয়া সংগ্রহ করবেন আর তাঁদেরকে উৎসাহিতও করবেন।

যখন শায়খ আব্দুল্লাহ গাজী ইসলামাবাদ ফিরে যান। তখন তিনি নিজের মাসজিদে প্রথম যে খুতবা দেন; তা ছিল, আফগানিস্তানের অবস্থা আর মুসলমানদের দেশসমূহে খ্রিস্টানদের হামলা আর তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সম্পর্কে। এমনিভাবে তিনি শায়খ উসামা বিন লাদেনের সাথে সাক্ষাতের কথাও বলেন। তাঁর দাওয়াতের সাথে একাত্মতা ও তাঁর কাজে সাহায্য করার ঘোষণাও দিলেন। এরপর শায়খ আব্দুল্লাহ গাজী রহ. কে তাঁর নিজ মাদরাসায় শহীদ করে দেওয়া হয়। তাঁর ছেলে আব্দুর রশীদ গাজী এক সাংবাদিকের সাথে সাক্ষাৎকারের সময় স্পষ্টতার সাথে এ কথাও বলেছিলেন, শায়খ উসামা বিন লাদেনের দাওয়াতে মুসলমানদের ভূমি মুক্ত করার আহ্বানে সাড়া প্রদানের কারণে তাঁর বাবাকে শহীদ করা হয়; এছাড়া জুলুম-ফাসাদ, মোশাররফের স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাও এর কারণ ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

এখানে এ কথারও উল্লেখ করা দরকার, কান্দাহারে শায়খ উসামা বিন লাদেনের সাথে সাক্ষাত করার জন্যে যত প্রতিনিধি দল এসেছিল, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ দলই শায়েখের কাছে নছিহত চাইতেন। তাঁদেরকে শায়খ উসামা বিন লাদেন সর্বদা একটা নছিহতই করতেন, তা হলো, ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পরিপূর্ণ সাহায্য করুন। তাঁরা শায়খ উসামার কাছে পাকিস্তানে কাজ করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন। শায়খ তাঁদেরকে বলতেন, "আপনারা ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সাহায্যের প্রতি খেয়াল করুন। যখন এটি মজবুত হয়ে যাবে; তো এর কল্যাণ অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।"

এমনিভাবে পাকিস্তানের আলেমদের মধ্যে যাদের সাথে উসামা রহ. এর সম্পর্ক ছিল। তাঁদের মাঝে একজন হলেন 'শায়খ ফযল মুহাম্মাদ হাফি.'। তিনি করাচীর একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিস। তিনি শায়খ উসামা বিন লাদেন এবং অন্যান্য মুজাহিদদের অন্তরঙ্গ সাথী। শায়খ ফযল মুহাম্মদ আর শায়খ উসামা বিন লাদেনের এক সাক্ষাতের সময় আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি মুজাহিদদের বিভিন্ন বিষয়ে দরদের সাথে পরামর্শ দিতেন। শায়খ ফযল মুহাম্মাদ ফাযায়েলে জিহাদের ওপর একটি কিতাবও রচনা করেন। যা উর্দূ আর পশতুতে ছাপা হয়। যদি এর আরবি অনুবাদ করা যায়, তাহলে ইনশাআল্লাহ তা থেকে অনেক উপকারের আশা করা যায়।

এগুলো ছিল শায়খ উসামার সাথে আলেমদের সম্পর্কের কিছু সংক্ষিপ্ত ঘটনা।

"তিনিই ছিলেন তোমার যুগের শ্রেষ্ঠ নেতা"

আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহ. এর স্মরণে...

তা ছিল এক বিস্ময়কর দৃশ্য:

কুফুরী শক্তি নিজের সকল বাহিনী সহ আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে একজন মুসলিমকে তাদের কাছে অর্পণ করার দাবী জানাচ্ছিল! চিন্তিত হয়ে পড়লেন উলামা-মাশায়েখগণ; নিজেদের মাথায় হাত রেখে বসে ভাবছিলেন– কী করার আছে এখন! নিজেদের আমীরকে এই বিষয়টিই তারা বুঝাতে চাচ্ছেন, আপনি এই যুদ্ধ সহ্য করতে পারবেন না। যুদ্ধে জড়িয়ে গেলে শরয়ী শাসন ব্যবস্থা আর ইমারতের সবই জমিনের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হবে। কিছুটা নরম আচরণ করুন! তাদের মোকাবিলা করার মতো সময় এখনো হয়নি। তারা (আমেরিকা) এক ব্যক্তির ইস্যু তুলে সব কিছু ধুলোয় মিশিয়ে দিবে। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী আমরা এটাই বুঝতে পারছি, আপনি তাঁকে (উসামা রহ. কে) কুফফারদের হাওলা করে দিবেন।

কিন্তু ঐ মরদে মুমিন উলামাদের কাছে একটি কথাই জানতে চেয়েছিলেন, উসামাকে কাফেরদের কাছে হাওলা করার ব্যাপারে আমাকে একটি শরয়ী দলীল দিন! তবেই আমি আপনাদের কথার ওপর ফায়সালা দিয়ে দিবো।

তাঁর এই কথা শুনে ক্রন্দন শুরু করলেন উপস্থিত উলামায়ে কেরাম! তাঁর এমন দৃঢ়তা দেখে বলতে লাগলেন– আল্লাহর কসম! উনি সাহাবায়ে কেরামের যুগের মানুষ। আর তারা ফিরে আসলেন নিজেদের মত থেকে, একমত হলেন মোল্লা উমর রহ. এর সিদ্ধান্তে।

অতঃপর দুনিয়া প্রত্যক্ষ করেছে– এই পাহাড়সম দৃঢ় ব্যক্তির ঐ ফায়সালার পর এমন এক যুগ শুরু হয়েছিল; যেখানে জমিন তাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, আসমান ও জমিন হতে আগুনের বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল তাদের ওপর। যেই লোকগুলো শুরুতে উনার সাথে থাকার দাবী করেছিল; তারাও পরিবর্তন করে নিল নিজেদের গন্তব্য আর কাফেরদের একান্ত সাহায্য-সহযোগিতাকারী হয়ে গেল!

কিন্তু তিনি? তিনি তো ছিলেন আল্লাহর বন্ধু। যিনি আপন সীনা উচুঁ করে বেপরোয়াভাবে কাফেরদের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। সকল বন্ধুরা ছেড়ে যাক! জিজ্ঞেসও না করুক কোনো দয়াবান ব্যক্তি! আমার আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট। আমাকে জগতের কেউ কিছু জিজ্ঞেস না করুক!

অতঃপর তিনি প্রাণোৎসর্গকারী আপন কিছু সাথীদের সঙ্গে নিলেন আর সীমিত অস্ত্র হাতেই মোকাবিলা শুরু করলেন দুনিয়ার কথিত সুপার পাওয়ার শক্তিগুলোর। এমনই ছিল আহলে ঈমানদের অবস্থা।

অপরদিকেও কিছু লোক ছিল; যারা ইসলামকে পশ্চাতে ফেলে অবস্থার পরিবর্তণ দেখে নিজেদের জাহাজও কাফেরদের কাতারে নিয়ে দাঁড় করাল। আর তারা বলতে লাগল– বাতাস যখন তীব্র হয়, তখন নিজের মাথা বাঁচানো দরকার; যাতে নিজের মাথা বাতাসে উড়ে না যায়! ইসলামের না'রা লাগানো এ সকল ব্যক্তি উল্টো ইসলামের নাম জপে, সেই ব্যক্তিদের জন্যে জমিন সংকীর্ণ করে দিতে লেগে গেল আর ডলারের প্রবাহিত নদীতে খুব ভালোভাবেই পরিস্কার করতে লাগল নিজেদের হাত। তারা গোলামিতে এত এত প্রমোশন পাচ্ছিল যে, তাদের মুনিবরাও খুশিতে বাগ বাগ হয়ে যাচ্ছিল। তারা কুফুরীর দালালির ক্ষেত্রে এমন স্থানে পৌঁছে গেল যে, ভাই তো আছেই বরং বোনকেও বিক্রি করার ক্ষেত্রে কোনো সুযোগ হাত ছাড়া করেনি।

কিন্তু দুনিয়া প্রত্যক্ষ করেছে, ঐ মরদে মুমিন হেরেও জিতে গেছেন এবং যুগের ফেরাউন জিতেও হেরে গেছে। সময় বয়ে চলেছে। যুগের নিত্য নতুন ঘটনা অবস্থাকে কোথায় থেকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে!

দুই সপ্তাহের ভেতর ঐ মরদে মুমিনকে হত্যার দাবীদাররা দূরবীন লাগিয়ে উম্মাহর এই বাহাদুরকে খুঁজছিল; ওরা ভেবেছিল– তিনি নিরাপত্তা ভিক্ষা করে ঐ সকল পাগল মাস্তানদের থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে নিবেন।

নিশ্চয় তিনিই তোমার যমানার শ্রেষ্ঠ নেতা। যিনি তোমাকে বর্তমান (পরাশক্তি) থেকে বিমুখ করিয়ে দিয়েছেন। এই বিষয়টি খুবই চিন্তার বিষয়– যারা এই বীর মুজাহিদের দৃঢ়তাকে 'বোকামি' বলেছিল; আজ তারা তাদের পরিণতিতে পৌঁছেছে।

তিনি তো (মোল্লা উমর) শরীয়তের হুকুম প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব আদায় করেছেন এবং অবশেষে ইসলামের ঝান্ডা উচুঁ করেই ছেড়েছেন। ভবিষ্যৎ দুনিয়াও তার গায়রতকে সালাম পেশ করতে থাকবে– তিনি নিজের সব কিছু কুরবান করে দিয়েছেন; তবুও এক মুসলিমকে কাফেরদের হাওলা না করে 'বাইয়াতে রেদওয়ান'কে জিন্দা করে দেখিয়েছেন।

অপরদিকে তথাকথিত 'হেকমত' এর আড়ালে লুকায়িত আত্মমর্যাদাহীন লোক; যাদের কাজকে হেকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ মনে করা হতো! এখন তা 'পাগলামি' হিসাবেই স্পষ্ট হচ্ছে। তারা আজ সেই আহমকির প্রায়শ্চিত্ত বহুত ক্ষতির মাধ্যমে আদায় করছে।

এই মরদে মুমিন আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু এ শিক্ষাই দিয়ে গেছেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে– সফলতা শুধুই আল্লাহর বিধান পুরা করার মাঝেই নিহিত। চাই পুরো দুনিয়া বিরোধী হোক! কিন্তু আল্লাহ সাথে থাকলে কোনো পরওয়া নেই।

যদি উদ্দেশ্য হাসিলে মনযিল পর্যন্ত পৌঁছা যায়; তাহলে তো কামিয়াব। আর যদি মনযিলে পৌঁছার আগেই রাস্তায় প্রাণ আল্লাহর কাছে সঁপে দিতে হয়; তাহলেও কামিয়াব।

এক আরব মুজাহিদ ও সৌদি হুকুমত

(তাগুতের হাতে গ্রেফতারের পূর্বে এক শহীদ আরব মুজাহিদের লিখিত শেষ প্রবন্ধ অনুকরণে)

উস্তায আহমাদ নাবীল হাফিজাহুল্লাহ

এক.

কেন আমি ওয়ান্টেড পার্সন? চারদিক থেকে জবাব আসতে লাগল: সন্ত্রাস... সন্ত্রাস ... (জঙ্গিবাদ)। তুমি সন্ত্রাসী (জঙ্গি)। আর সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে– সন্ত্রাসকে দমন করা, জঙ্গিবাদের নির্মূল করা। ঠিক আছে...। সন্ত্রাসের এই অপরাধ থেকে আমি মুক্ত হতে চাই, যার ফলে আমি আজ মোস্ট ওয়ান্টেড– আমাকে বন্দী ও হত্যা করা সরকারের দায়িত্ব। বলুন, কি সেই সন্ত্রাসটি? উত্তর: মানুষ হত্যা ...।

কিন্তু ....! সৌদি সরকারও তো মানুষ হত্যা করে। তারা শায়খ ইউসুফ আল ওয়াইরী, বীর মুজাহিদ দান্দানীসহ অন্যান্য আলেম ও মুজাহিদীনদেরকে হত্যা করেছে। তাহলে সৌদি সরকারও সন্ত্রাসী। সুতরাং আমরা যখন উভয়েই সন্ত্রাসী আমাদের ওপর আবশ্যক হচ্ছে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সাথে সামনে বাড়া; তাহলে আমি তাদের কাছে ওয়ান্টেড হলাম কেন? নাকি সৌদি সরকার আমার থেকে ভিন্ন? কেননা সৌদি সরকার যাদেরকে হত্যা করেছে; তারা সন্ত্রাসী?

ভালো কথা ...। আমিও তো সন্ত্রাসীদেরকেই হত্যা করেছি। আমেরিকানরা কি সন্ত্রাসী নয়? ইরাক, আফগানিস্থান, ফিলিস্তিন সহ অন্যান্য ভূখণ্ডে আমেরিকা যে সন্ত্রাস করেছে; এর চেয়ে বড় কোনো সন্ত্রাস হতে পারে?! আমিও সন্ত্রাসীদেরকে হত্যা করলাম, সৌদি সরকারও সন্ত্রাসীদেরকে হত্যা করল!! তাহলে আমি কেন সন্ত্রাসী হবো? অথচ আমরা উভয় একই কাজ করছি, সন্ত্রাসীদেরকে হত্যা করছি?! বরং সৌদি সরকারই এমন অনেককে হত্যা করছে; যারা সন্ত্রাসী নয়। তারা মার্কিন বাহিনী-কে সহায়তার মাধ্যমে ইরাকের সাধারণ জনগণকে হত্যা করেনি?! নাকি সৌদি সরকার আমাকে ওয়ান্টেড সন্ত্রাসী হিসাবে কালো তালিকাভুক্ত করেছে এ কারণে যে, আমি ঐ সৈনিকদেরকে হত্যা করেছি; যারা আমেরিকান সন্ত্রাসীদেরকে পাহারা ও নিরাপত্তা দিত?! তাহলে সৌদি সরকার কি ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে হত্যা করেনি; যারা সন্ত্রাসীদেরকে পাহারা দিত?! যেমনটি করেছে তারা কাসীমের মধ্যে। আমেরিকান সন্ত্রাসীদের পাহারাদার আর অন্যান্য সন্ত্রাসীদের পাহারাদারদের মাঝে কী এমন পার্থক্য বিদ্যমান?!

দুই.

মনে হয়, এখন আমি বুঝতে পেরেছি! সৌদি সরকার আমাকে

ওয়ান্টেড ঘোষণা দিয়েছে কারণ আমি সন্ত্রাসীদের বন্ধু, তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল আর নিঃসন্দেহে সন্ত্রাসীর বন্ধুও সন্ত্রাসী। কিন্তু সৌদি সরকার কি ঘোষণা দেয়নি?– আমেরিকা তাদের বন্ধু?! পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী কি আমেরিকা নয়?! প্রতিটি ক্ষেত্রে সৌদি ও আমেরিকার মধ্যকার গভীর সম্পর্কের ব্যাপারটা কি মন্ত্রীরা নিশ্চিত করেনি?!! অনুগ্রহ করে আমাকে জবাব দাও! কেন আমি ওয়ান্টেড হলাম?! আমি যেমন সন্ত্রাসী সৌদি সরকারও কি একই রকম সন্ত্রাসী নয়?! তাহলে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে তাদের ভ্রাতাকে কীভাবে তারা তাড়া করে? আমি হত্যা করেছি আমেরিকান সন্ত্রাসীদের পাহারাদারদেরকে, সৌদি হুকুমত হত্যা করছে শরয়ী ইসলামি 'সন্ত্রাসীদের' আশ্রয়দাত-াদেরকে। আমি যেমন সন্ত্রাসীদেরকে ভালোবাসি, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করি; সৌদি সরকারও মার্কিন সন্ত্রাসীদেরকে ভালোবাসে, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে। বরং তারা এই বন্ধুত্ব নিয়ে গর্ব প্রকাশ করে থাকে।

তিন.

হতে পারে– আমি ওয়ান্টেড সন্ত্রাসী; কারণ আমি মুসলিমদের দেশে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছি। কিন্তু .... । ইরাক মুসলিমদের দেশ, আমেরিকা ইরাকে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। জঙ্গি বিমান থেকে মিসাইলের আঘাতে পুরো দেশকে চূর্ণ বিচূর্ণ করেছে। অথচ সৌদি আমেরিকাকে ওয়ান্টেড হিসাবে আখ্যায়িত করে না। এমনকি শত্রু পর্যন্ত ভাবে না; বরং তাদেরকে সাহায্য করে। সৌদি সরকারের কাছে কোনো প্রমাণ আছে কি?– আমি সন্ত্রাসীদেরকে কোনো সাহায্য করেছি? যদি থাকে তাহলে ভালো কথা! একইভাবে সৌদি সরকারও আমেরিকান সন্ত্রাসীদেরকে, তাদের সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। আমি কি তাদের আশ্রয় দিয়েছি? সৌদি সরকার মার্কিন বাহিনীকে আশ্রয় দিয়েছে। আমি কি তাদের অস্ত্রের হেফাজত করেছি? সৌদি সরকার সৌদিকে আমেরিকার অস্ত্রগুদাম বানিয়েছে। তারা কি আমার কাছ থেকে তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করেছে? মার্কিন বিমানগুলো সৌদি থেকে ইরাকে গিয়ে তাদের সন্ত্রাস পরিচালনা করছে। আমি কি তাদেরকে মাল দিয়ে সাহায্য করছি? অথচ ইরাক-আফগানের যুদ্ধে সৌদি হচ্ছে, আমেরিকান সন্ত্রাসীদেরকে সাহায্যকারী অন্যতম একটি রাষ্ট্র। ওহে সৌদি শাসকগোষ্ঠী! তোমরা লক্ষ্য করো, আমরা আর তোমরা উভয়েই সন্ত্রাসের অংশীদার! হ্যাঁ, তবে যদি আমি তোমাদের থেকে বেশি করে থাকি, আলহামদুলিল্লাহ! কেননা আমি মুসলিম।

চার.

হ্যাঁ, এখন আমার বুঝে এসেছে, আমি সন্ত্রাসী; কেননা আমি সৌদি শাসকদেরকে তাকফীর করেছি। কিন্তু ...! উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় তো সৌদি সরকারও সাদ্দামকে তাকফীর করেছিল! সৌদি সরকার সাদ্দামকে কেন তাকফীর করল? এই কারণে তাকফীর করেছে, সে আল্লাহ তাআলার বিধান ছাড়া ভিন্ন বিধানে শাসন পরিচালনা করে। সৌদি সরকারও তো আল্লাহ তাআলার বিধান ব্যতিরেকে ভিন্ন বিধানে শাসন পরিচালনা করে থাকে। আর আমি তো তাকফীরের এই ফতওয়া পেয়েছি সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলে-শায়খ রহ. এর ফতওয়া থেকে; যার ফলে এই ফতওয়া সৌদি সরকার বাজারে নিষিদ্ধ করেছে। শায়খ আবদুল্লাহ বিন হামীদসহ অন্যান্য শায়খদের থেকেও একই ফতওয়া বিদ্যমান আছে। আর আমি দেখছি বিলাদুল হারামাইনের অধিকাংশ বিষয়ে, মানব রচিত আইন দ্বারা ফায়সালা করা হয়। তাহলে কেন তারা সাদ্দামকে তাকফীর করল? উত্তর: এ কারণে যে, সে একজন বাথিস্ট। বাথিস্ট কি? এই শব্দে তো ঈমান ভঙ্গের কারণ সমূহের মধ্যে কোনো কারণ বিদ্যমান নেই। তারা কি এ কারণেই কুফর মনে করে না যে, বাথিস্টদের কাছে সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্বের মাপকাঠি হচ্ছে– দ্বীনের পরিবর্তে জাতীয়তা? সৌদির কাছেও তো সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের মাপকাঠি, দ্বীনের পরিবর্তে দেশ ও আরব জাতীয়তার ওপর। বাথিস্টরা কি এ জন্যে কাফের? কেননা তাদের কাছে একজন আজমি মুসলিমের চেয়ে আরবি কাফের শ্রেষ্ঠ? আরব জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সৌদি শাসকদের কাছে একজন আরবি কাফের একজন বাংলাদেশী মুসলিমের চেয়ে উত্তম। হ্যাঁ, যদি আমি এ কারণেই সন্ত্রাসী হই যে, আমি সৌদি সরকারকে কাফের মনে করি। তাহলে সৌদি সরকারও এ জন্যে সন্ত্রাসী যে, তারা সাদ্দাম হুসাইনকে কাফের মনে করে। বরং সৌদি সরকার এ ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে– ১১ই সেপ্টেম্বরের মোবারক আক্রমণ পরিচালনাকারী বীরদেরকে সুলতান বিন আব্দুল আযীয তাকফীর করেছে। সে বলেছে, তারা নাকি ইসলামি মিল্লাত থেকে খারেজ হয়ে গেছে। তাহলে যেভাবে আমি ওয়ান্টেড একইভাবে সুলতান বিন আব্দুল আযীযও যেন ওয়ান্টেড হয়। রিয়াদের মধ্যে মার্কিন ক্রুসে-ডারদের ওপর আক্রমণ পরিচালনাকারীদেরকে আব্দুল্লাহ তাকফীর করেছে। সুতরাং আমার মত যেন আবদুল্লাহ ওয়ান্টেড হিসাবে গণ্য হয়। ওরে সন্ত্রাসীর দল! আমাকে ঐ সন্ত্রাস বোঝাও! যেটার কারণে আমাকে তোমরা ওয়ান্টেড আখ্যায়িত করছ?! আমি যা করেছি তা কি আমেরিকা করেনি?! বরং এর চেয়ে অনেক অনেক বেশি করেছে। তাহলে তারা কেন সন্ত্রাসী (জঙ্গি) হচ্ছে না?! কেন আমেরিকার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ অপরাধ বলে বিবেচিত হচ্ছে না?! যেভাবে আমার প্রতি সহানু-ভূতি প্রকাশ অপরাধ বলে গণ্য হচ্ছে?! আমাকে কি তোমরা নাসারা (খ্রিস্টান) হতে বলছ?! কুফরী করতে বলছ?! তাহলে আমেরিকার মতো আমি এই সন্ত্রাসের অপরাধ থেকে মুক্তি পাব?! এটাই কি সৌদি সরকার আমার থেকে আশা করে?! ইয়াহুদী-নাসারা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না; যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্ম গ্রহণ করো। সৌদি সরকার সন্ত্রাস করেছে। সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে সহানুভূতি দেখিয়েছে। সন্ত্রাসীদেরকে সাহায্য করেছে। তাদেরকে মাল দিয়ে শক্তিশালী করেছে। মার্কিন সন্ত্রাসীদের ক্ষেত্রে সব করেছে। তথাপি কেন তারা জঙ্গি-সন্ত্রাসী হবে না?! এই কারণে কি, তারা হচ্ছে একটা হুকুমত বা সরকার?! তাহলে আমার ওপরও তো আবশ্যক হচ্ছে– যে কোনো ভাবে ক্ষমতা দখল করা। যাতে আমিও এই সন্ত্রাসের অভিযোগ থেকে মুক্তি পাই।

পাঁচ.

আচ্ছা, ঠিক আছে। যা আলোচনা হলো সব বাদ। যদিও আমি কোনো অভিযোগ ব্যতিরেকেই অভিযুক্ত! যে সৌদি সরকার আমাকে ওয়ান্টেড আখ্যায়িত করেছে, যদিও সে আমার চেয়ে অনেক বেশী অপরাধে অপরাধী; তথাপি আমি নিজেকে সমর্পণ করবো! তবে আমি কিছু শর্ত দেবো। আমি এমন শর্ত দেবো না, যার হক্ব শরীয়ত আমাকে দেয়নি। আমার প্রথম শর্ত হচ্ছে– আমার ফায়সালা করতে হবে শরয়ী মাহকামাতে, ইনসাফের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রকাশ্য মাহকামা। আমার আরেকটি শর্ত হচ্ছে– আমাকে নির্যাতন করা যাবে না। আমার শেষ শর্ত– আমার যে সমস্ত আপনজনকে সরকার জিম্মি হিসাবে আটক করেছে, তাদেরকে মুক্তি দিতে হবে। হ্যাঁ, এগুলোই আমার শর্ত। কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে, সৌদি সরকার আমাকে জেলে ভরবে, আমার সকল শর্ত অস্বীকার করবে। তাহলে আমার পক্ষে কীভাবে সম্ভব হবে? সরকারকে এই শর্ত পূরণে বাধ্য করতে; অথচ আমি জিন্দানখানায় শিকলাবদ্ধ! একটা সমাধান পেয়েছি, আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্ক আছে এমন কোনো শায়খের কাছে যাবো। তিনি হতে পারেন, সাফার আল- হেওালী। আমি তার কাছে আমার শর্তগুলো পেশ করবো, তাকে এ ব্যাপারে সরকারের সাথে আলোচনা করতে বলবো। তিনি যে এটা করতে সক্ষম হবেন, আমি এই নিশ্চয়তা পাবো কীভাবে? হ্যাঁ, এটা করা যেতে পারে– সরকার শর্ত মানলে তাকে এ ব্যাপারে মিডিয়ার মধ্যে প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে হবে। কিন্তু....! এই একই কাজ কি ফাকআসী করেননি? ফাকআসীর শর্তগুলো হেওালী কি সৌদি পত্রিকাসমূহের মধ্যে প্রকাশ করেননি? তথাপি ফাকআসী তার হক্বসমূহের নিশ্চয়তা পেয়েছে কি? না পায়নি! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নায়েফ দৃশ্যপটে এলো, সে হেওালী-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল। ফাকআসীর শর্তসমূহ অস্বীকার করল। নায়েফের দাবী অনুযায়ী হেওালি মিথ্যা বলেছিল কি? না এটাই স্বাভাবিক যে, নায়েফ হেওালীকে মিথ্যার অপবাদ দিয়েছে? তাহলে দুর্বল কারাবন্দী ফাকআসীর ক্ষেত্রে কি অবস্থা হয়েছে? আর কে আছে এমন, যে ফাকআসীর শর্তের নিশ্চয়তা দেবে? তার জামিন নেবে? আমি আত্মসমর্পণের চিন্তা থেকে সরে এসেছি, কারণ আমি যে সতর্কতাই নিতে চাই; ফাকআসী তাই গ্রহণ করেছিল; কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। তাই মৃত্যুই আমার কাছে উত্তম ও অধিক প্রিয়।

ছয়.

যদিও আমি আত্মসমর্পণের চিন্তা বাদ দিয়েছি; কিন্তু সন্ত্রাসের অভিযোগ থেকে মুক্ত হবার দৃঢ় সংকল্প থেকে পিছে সরে আসতে পারিনি। সন্ত্রাসের সকল উপকরণ দ্বারা সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করছে আমেরিকা। তাদেরকে সন্ত্রাসের সকল সংজ্ঞা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায়। অথচ অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো আমেরিকার ভালোবাসা অর্জনে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, আমাকে অপরাধী সাব্যস্তকারী সৌদি সরকার এ ক্ষেত্রে আরও অগ্রগ-ামী। আমেরিকার সাথে বন্ধুত্ব, সম্পর্ক ও ভালবাসা তাদের জন্যে গর্বের ব্যাপার কেন? অথচ আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ অপরাধ!! যে রাষ্ট্র মার্কিন সন্ত্রাসীদেরকে সাহায্য করে, তার সাথে সম্পর্ক রাখা জনগণের ওপর ওয়াজিব কেন?!! আর শরয়ী জঙ্গিদের (সন্ত্রাসীদের) ব্যাপারে সামান্য সহানুভূতি প্রকাশ জনগণের জন্যে হারাম কেন?!! সন্ত্রাসী সৌদি সরকারকে সাহায্য করা, কেন জনগণের ওপর আবশ্যক? আর আমাদেরকে সাহায্য করা হারাম?!! আমি কারণ খুঁজে পেয়েছি। হ্যাঁ... হ্যাঁ...আমি এখন কারণ বুঝতে পেরেছি ...। আমি উসামা রহ. এর আওয়াজ শুনতে পেলাম–

إنَّ الناس يميلون مع القوي

إرهابُنا جريمة .. وإرهاب أمريكا أمر مشروع

أبرياؤهم أبرياء .. وأبرياؤنا ليسوا أبرياء

মানুষেরা ঝোঁকে শক্তিশালীর দিকে ..

আমাদের 'সন্ত্রাস' হচ্ছে অপরাধ!

আর আমেরিকার সন্ত্রাস হচ্ছে বৈধ!

তাদের নিরাপরাধ জনসাধারণ নিরপরাধ!

আর আমাদের নিরপরাধ জনসাধারণ অপরাধী!!

আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহম করুন, হে উসামা!
এখন বুঝেছি কবিতার পংক্তি।
এখন চিনেছি ঘোড়ার লাগাম।
এখন পেয়েছি সমস্যার সমাধান! হ্যাঁ, এখন বুঝেছি। আমাকে শক্তিশালী হতে হবে।
যখন তুমি শক্তিশালী হবে, তখন তুমি যাই করো, সন্ত্রাসী হবে না।
ঠিক আছে! কিন্তু আমি যে দুর্বল এটা তাদেরকে কে বলল? হয়তো আমি শক্তিশালী কিন্তু সেটা তারা জানে না! আচ্ছা! তাদেরকে আমার শক্তি দেখাতে হবে, যেমন তারা আমেরিকার শক্তি দেখেছে।
আর তখনি আমার সাথে ক্ষমতাশীলরা উষ্ণ বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে। তখনি সৌদি শাসক নড়েচড়ে বসবে, আমার সাথে চুক্তি করতে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
এই শাসকই তো শ্যারন এর সাথে চুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।
ইয়াহুদী সন্ত্রাসী শ্যারন কি একজন মুসলিম জঙ্গির চেয়ে ভালো? সন্ত্রাসের (জঙ্গিবাদের) অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার এক মাত্র উপায় হচ্ছে– তোমাকে শক্তিশালী হতে হবে। ঠিক আছে, কিছু সময় অপেক্ষা করো!
অচিরেই ইনশাআল্লাহ তোমরা আমরা শক্তি দেখতে পাবে।
এটাই ইসলামি সন্ত্রাসীর বার্তা..। হে আল্লাহ!
আপনি মুজাহিদীন সন্ত্রাসীদের ত্রাসকে আপনার পথে কবুল করুন। হে আল্লাহ! আপনি নিহত জঙ্গিদের রূহগুলোকে আপনার পথে গ্রহণ করুন। আমীন

মনিরুলদের হাসির আড়ালে কত মাজলুমের রক্তাক্ত উপাখ্যান যে লুকায়িত!

মুসাল্লাহ কাতিব

দ্বীনের জন্যে বিপদ-মুসীবতকে মুমিনরাই সাদরে গ্রহণ করে থাকে। আর এটা আমাদের দ্বীনেরই অংশ। পরীক্ষা আসলে কীভাবে ধৈর্য ধারণ করতে হয়; তা আমরা কুরআন-সুন্নাহ ও পূর্বসূরিগণ থেকে শিক্ষা পেয়েছি। দ্বীনের ক্ষেত্রে যে যত বেশি অগ্রগামী; তার পরীক্ষাও তত বেশি কঠিন। আবার যে দ্বীনের ক্ষেত্রে শিথিল; তার পরীক্ষাও তার দ্বীনের পরিমাপ অনুযায়ী হবে। যেমনিভাবে, যার ঈমান যত বেশি গভীর; কুফর ও তাগুতের প্রতি তার শত্রুতা ও বিদ্বেষ তত বেশি। আর যার অন্তরে নিফাকের গভীরতা যত বেশি; কুফর ও তাগুতের সাথে তার বন্ধুত্ব ও সখ্যতা তত বেশি। মূলতঃ এগুলোই ঈমানের মানদণ্ড।

আমাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমন এক দ্বীনের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন; যা শক্তি থাকা সত্ত্বেও ইনসাফ, সহনশীলতা, উদারতার নির্দেশ দেয়। আবার নিজের উচ্চতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা রক্ষার জন্যে সমরশক্তি প্রয়োগেও পিছপা হয় না। আমাদের পূর্বসূরির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তালাশ করে দেখুন, তারা দ্বীনকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করতে জীবনবাজি রেখে বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন এবং সীমালঙ্ঘনকারী জালেমদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে ছেড়েছেন; কিন্তু পরাজিত ও বন্দীর সাথে সীমা-লঙ্ঘন করেননি। পৃথিবীর ইতিহাসে শত্রুর প্রতি এত উদারতা আর কোনো জাতি দেখাতে পারেনি। পারবেও না ইনশাআল্লাহ।

দীর্ঘ ভূমিকা টেনে আমি মূলতঃ এই কথাই বুঝাতে চাচ্ছি, কুফর ও তাগুতের অনুসারীরা ভীরু ও জালিম হয়ে থাকে। সীমালঙ্ঘন, জুলুম-নির্যাতন, হীনতা, মিথ্যা ও কপটতা তাদের রক্তের সাথে মিশে আছে। বিশেষ করে, নিরস্ত্র, অসহায় ও বন্দীদের ওপর; এমনকি মহিলা-শিশুদের ওপরও তারা তাদের বীরত্ব জাহির করতে লজ্জাবোধ করে না। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে তাওহীদবাদী এবং শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার তরে লড়াইরত মুসলিমদের জন্যে তাগুত সরকার ও তার বাহিনী কারাগারে যে ধরনের জুলুম-নির্যাতনের ইন্তেজাম করে রেখেছে; তার বর্ণনা করতে যেমনি কলম ভারি হয়ে আসে, তেমনি কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের লোক এর দাস্তান শুনে তা সহ্য করতেও অক্ষম।

মুসলিম বন্দীদের ওপর তাদের বর্বরতার কাহিনী কত করুণ, তা ফুটে ওঠে 'শতাব্দীর আন্দামান থেকে বলছি' নামক একটি চিঠি থেকে; যা এক নির্যাতিত বন্দী ভাই কারাগার থেকে লিখেছিলেন। মুসলমানদের ভূমিতে মুসলমানদের টাকায় প্রতিপালিত জানোয়ারগুলো জোরপূর্বক স্বীকারোক্তির জন্যে মুসলমানদের সন্তানদের নির্যাতন, অঙ্গহানি, মা-বোনদের শ্লীলতাহানি সহ সকল প্রকার বর্বরতা প্রয়োগ করছে। তাদের নির্যাতনের ধরন দেখে শয়তানও লজ্জা পাবে। তারা এমন আধুনিক এক সভ্যতার খোলস পরে আছে; যার অভ্যন্তর অত্যন্ত কুৎসিত ও বীভৎস। যারা মানুষের লজ্জাস্থানসমূহকে নির্যাতনের টার্গেট বানাতে কুণ্ঠিত হয় না। তাদের কথিত মানবাধিকার নামক 'বোবা শয়তান' এই ক্ষেত্রে নীরব; যেন মুসলমানদের মানবাধিকার থাকতে নেই!

সারা বিশ্বের কুফর ও তাগুতি শক্তি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, তাদের একমাত্র শত্রু মুজাহিদরাই আর শয়তানি রাজত্ব কায়েম করার ক্ষেত্রে এরাই একমাত্র বাধা। তাই মুজাহিদদের নির্মূল করার জন্যে মিথ্যা মামলা, গুম, খুনসহ সকল প্রকার ষড়যন্ত্র তারা করে যাচ্ছে। তারা এত কাপুরুষ যে, শায়খ ড. উমর আব্দুর রহমান রহ. এর মতো অন্ধ-অচল ব্যক্তিকেও তাদের নিরাপত্তার জন্যে হুমকি মনে করে বন্দী করে রেখেছি-ল। যিনি হক্ব কথা বলতে গিয়ে শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ সময় তাগুতের কারাগারে বন্দী ছিলেন; এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁর লাশ জেলখানা থেকে বের হয়েছে। অথচ বাতিলের সাথে কোনো আপোষ করেননি। দ্বীনের জন্যে এমন ত্যাগের দৃষ্টান্ত কেবল ইসলামের ইতিহাসেই পাওয়া যায়।

বাংলাদেশেও অনেক হক্কানি আলেমকে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে অন্যায়ভাবে আটকে রেখে নির্যাতন করা হচ্ছে; একমাত্র হক্কের পক্ষে কথা বলার জন্যে, তাওহীদ ও জিহাদের কথা এবং শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার কথা বলার জন্যে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, আলেমরা আশংকাজনক হারে গ্রেপ্তার ও নিখোঁজ হচ্ছেন। অনেক স্পষ্টভাষী হক্ব আলেমদের এই মুরতাদ বাহিনী গুম করা শুরু করেছে। যা এ দেশের মুসলমানদের জন্যে অত্যন্ত দুঃসংবাদ। আল্লাহ আমাদের রাহবারদের হেফাজত করুন।

এ দেশের কাপুরুষ বাহিনীর অন্যতম একটি কাজ হলো, মিথ্যা নাটক সাজিয়ে সাধারণ জনগণকে প্রতারিত করা এবং মিথ্যার রাজত্ব কায়েম করা। তারা দীর্ঘদিন যাবৎ কাউকে গুম করে রেখে তাদের কুখ্যাত টর্চারসেলগুলোতে অমানবিক নির্যাতন চালায়। অতঃপর এক-দু'মাস পর কোনো এক জায়গা থেকে তাকে জঙ্গি প্রশিক্ষণরত অবস্থায় গ্রেপ্তার দেখাবে; হলুদ মিডিয়ায় ফলাও করে প্রচার করবে, এই ভয়ংকর জঙ্গিকে আজই অমুক জায়গা থেকে সশস্ত্র অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অথচ ওই ব্যক্তিকে আগে থেকেই গুম করে নির্যাতন করা হচ্ছিল। এমন অমানবিক ঘটনা এ দেশে অহরহ ঘটে চলছে; কিন্তু সাধারণ মানুষ বেখবর এবং দাজ্জালি মিডিয়ার মাধ্যমে প্রতারণার শিকার।

পরিশেষে তাগুত বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাই, কারাগা-র, নির্যাতন আর হত্যা দ্বারা মুজাহিদদের অগ্রযাত্রাকে রুখা যাবে না। ইবনে তাইমিয়াহ রহ. যথার্থই বলেছিলেন, "শত্রুরা আমার কীইবা করতে পারবে? আমার জান্নাত তো আমার অন্তরে। কারাগার আমার ইবাদাতের জন্যে নির্জন আশ্রয়স্থল, মৃত্যুদণ্ড আমার জন্যে শাহাদাতের সুযোগ, আর দেশ থেকে নির্বাসন হচ্ছে আমার জন্যে এক আধ্যাত্মিক ভ্রমণ।" সুতরাং মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়েও কোনো ফায়দা নেই; কারণ আমাদের পথ আমাদের কাছে স্পষ্ট।

মুসলিম উম্মাহর সামনে তোমাদের মুখোশ উন্মোচন হয়ে পড়েছে। তোমাদের প্রতারণা ও বর্বরতা মুমিন-মুজাহিদদের সত্যের পথে অবিচলতা বহুগুণে বাড়িয়ে দিচ্ছে। কেননা, আল্লাহর সাহায্য কেবল মুমিনদের সাথেই থাকে। তবে, আমরা আমাদের মাজলুম বন্দী ভাইদের আর্তনাদ কখনো ভুলে যাবো না; বরং এমনভাবে প্রতিশোধ নেবো যে, জালেম তাগুতরা আফসোস করারও সুযোগ পাবে না। আল্লাহ আমাদের হাত দ্বারা এই জালেমদের শাস্তি তরান্বিত করুন এবং বন্দীদের মুক্ত করার শক্তি দান করুন। আমীন।

ধীরে বন্ধু ধীরে...

// আব্দুল্লাহ তাশফীন

এক. গেল দুই সপ্তাহে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে তুমুল আলোচিত কিছু ঘটনার দিকে একবার নজর বুলানো যাক:

১ম ঘটনা:- রাসায়নিক হামলা। টার্গেট: সিরিয়ার ইদলিব। হতাহত: নিহত শতাধিক; আহত চারশত। অধিকাংশই শিশু।

২য় ঘটনা: টমাহক ক্রুজ মিসাইল হামলা। টার্গেট: সিরিয়ার শাইরাত বিমান ঘাঁটি। ক্ষয়ক্ষতি: কিছু যুদ্ধবিমান ধ্বংস ও ৬/৭ জন আসাদ রেজিমেন্টের সৈনিক নিহত। আর বিমান বন্দরের আংশিক ক্ষতি।

৩য় ঘটনা: মোয়্যাব (মাদার অব অল বোম্‌স) হামলা। টার্গেট: আফগানিস্তানের নানগারহার প্রদেশের পার্বত্যাঞ্চল। হতাহত: আন্তর্জাতিক লেজুড় মিডিয়ার তথ্যমতে ৩৬-৪০ জন আইএস যোদ্ধা।

৪র্থ ঘটনা: তুরস্কের ক্ষমতাসীন একে পার্টি তথা এরদোগানের গণভোটে বিজয় লাভ।

এছাড়াও উত্তর কোরিয়ার পারমানবিক হামলার হুমকি ও তৎপরবর্তী আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের যুদ্ধ যুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি। এ সবই ছিল আলোচনা-সমালোচ-নার কেন্দ্রবিন্দুতে।

দুই. এবার আসা যাক বিশ্লেষণে। শুরুটা হয়েছিল আসাদের রাসায়নিক হামলার মাধ্যমে। অসহায় নারী-শিশুদের কেন বারবার টার্গেট করা হচ্ছে? এরাও কি সন্ত্রাসী? বিষাক্ত গ্যাসের কারণে ভারী হয়ে উঠছে পরিবেশ। এ কেমন বর্বরতা! এ কেমন কাপুরুষতা! সিরিয়াযুদ্ধে এ পর্যন্ত ৮ লাখের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে।

আমেরিকার ৫৯ টি ক্রুজ মিসাইল আঘাত হানে শাইরাত বিমান ঘাঁটিতে। এ নিউজটি রীতিমত মিডিয়ায় হটকেকে পরিণত হয়! এখনই বুঝি বাঁধবে আমেরিকা-রাশিয়া যুদ্ধ! কিন্তু বাস্তবতা হলো, রাশিয়ার সাথে সমঝোতার ভিত্তিতেই এ হামলা চালানো হয়। আর ক্ষয়ক্ষতি? পরিত্যাজ্য কিছু বিমান ধ্বংস আর বিমানবন্দরের আংশিক ক্ষতিসাধন! উদ্দেশ্য, রাসায়নিক হামলা থেকে নজর সরানো হোক কিংবা অন্য কিছু; শয়তানে শয়তানে ঠোকাঠুকি করুক, আমরা তাই কামনা করি।

সিরিয়ায় হামলার রেশ না কাটতেই দ্বিতীয় হামলাটি চালানো হয় আফগানিস্তানে। অ-পারমানবিক সবচেয়ে ভয়ংকর ও দৈত্যাকার ৯.৮ মেট্রিকটন ওজনের এ বোমা আঘাত হানে তাদের ভাষায়, আইএস এর ডেরায়! অথচ বাস্তবতা হলো, পাক-আফগান সীমান্তবর্তী নানগারহার প্রদেশের জনমানবশূন্য মালভূমিতে এ হামলা চালানো হয়। মিডিয়ায় হামলার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে কোনোরকম উচ্চবাচ্য লক্ষ করা যায়নি। বিষয়টি বড় রহস্যজনক ঠেকেছে!!

এ বোমার ব্যবহার ইতঃপূর্বে আমেরিকা কোথাও করেনি; না ইরাকে না ভিয়েতনামে, না ইতঃপূর্বে আফগানিস্তানে তালেবানের ওপর। অথচ আমেরিকা আফগানিস্তানে সবচেয়ে বড় ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়, যখন জর্দান বংশো দ্ভূত হুমাম বালভী (আবু দুজানা খোরাসানী) নামক এক দ্বৈত এজেন্ট, যিনি মূলতঃ আল কায়েদার হয়ে কাজ করেছেন, কর্তৃক ফেদায়ী হামলায় তাদের সর্বসেরা ৫ জন গোয়েন্দা কর্মকর্তা নিহত হয়। বুশ তখন শোকবার্তায় বলেছিল, এ ক্ষতি পূরণ হবার নয়!

সে সময়েও তারা এ ভয়ংকর অস্ত্রটির প্রয়োগ করেনি। তাছাড়া আফগানিস্তানে কতবার তারা তালেবানের সাঁড়াশি হামলার শিকার হয়েছে। যার ফলে তাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তখনও তারা এর প্রয়োগ করেনি। এর চেয়ে অবাক করা তথ্য হলো, যেদিন এ বোমাটি ফেলা হয়, সেদিনও তালেবানরা ৭ জন আমেরিকান সৈন্য হত্যা করে। এরপর গত ১৭/৪/২০১৭ইং আমেরিকার টহল দলের ওপর তালেবান হামলা চালায়। এতেও ৬ জন সৈন্য নিহত ও ২ জন আহত হয়। এত কিছুর পরও হামলা হলো, আইএসের কথিত ডেরায়!! আইএস এখনো পর্যন্ত এ হামলায় তাদের ক্ষয়ক্ষতির সঠিক তথ্য দিতে পারেনি। তবে হাঁড়ির খবর হলো, এ হামলায় তাদের টিকিটিও নড়চড় হয়নি। কারণ হামলা হয়েছে বিরাণভূমিতে।
প্রশ্ন জাগে, কেন সেখানে হামলা করা হলো? আইএসের বাড়াবাড়ী ঠেকাতে? তাহলে ফাঁকা ময়দানে কেন? যদি তাই হতো, তাহলে এ হামলা সিরিয়া কিংবা ইরাকে আইএসের নিয়ন্ত্রিত এলাকাতে হবার কথা।

আসল কথা হলো, আমেরিকা চায় আইএস জুজু জিইয়ে রাখতে! আফগানিস্তানে আইএস যখন সর্বসাকল্যে ২টি জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে কোণঠাসা অবস্থায় আছে। এ হামলার প্রেক্ষিতে তাদের নিয়ে মাতামাতি হবে। মানুষ জানবে, আফগানিস্তানে আইএস তালেবানের চেয়ে শক্তিশালী। আর এতে করে তাদের প্রতি সিমপ্যাথি বাড়বে!

অথচ দেখুন, আফগানিস্তানে যাদের হাতে আইএসের জন্ম; তাদের একজন ক্বারী ইয়াসির। সে-ই সর্বপ্রথম তালেবানকে মুরতাদ ঘোষণা করে! অথচ এর কিছু দিন পর সে আরো ৫ জন সঙ্গীসহ সরকারী বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং স্বীকার করে যে, সে আফগান সরকারের গোয়েন্দা কর্মকর্তা!!

তাছাড়া, আফগানিস্তানে আইএসের নামে বিবৃতি প্রদানকারী সিআইএর কর্মকর্তা, এ সব তো প্রমাণিত।

তালেবান মুখপাত্র ক্বারী মুহাম্মাদ ইউসুফ এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন, 'আমরা পরপর ৩ বার তাদের সমূলে উৎখাত করার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছি। কিন্তু প্রত্যেক বারই আশ্চর্যজনকভাবে আমেরিকান জেট ফাইটারগুলো তাদের রক্ষায় এগিয়ে এসেছে।'

তিন. তাই বলি, কুফফারদের ষড়যন্ত্র বড় জটিল ও কুটিল। এরদোগানের বিজয়ে অতি উৎফুল্ল হওয়ার যেমন কোনো কারণ নেই, তেমনি রাশিয়া-ইরানের বিরোধিতা করতে গিয়ে আমেরিকার পক্ষ নেয়ারও যৌক্তিকতা নেই। চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

বড় কষ্ট লাগে যখন দেখি, কিছু আবেগী মানুষ আমেরিকার বিরোধিতা করতে গিয়ে বাশারের পক্ষ নেয়। ইরানের প্রশংসায় গদগদ করে, আবার নিজেদের সুন্নী দাবী করে! এদের জন্যে করুণা হয়! এরা কি আলেপ্পো, ইদলিব, হামা, হোমস, গুতা'র শিশুদের ঝলসানো লাশের কথা ভুলে যায়? মুসলিম নারীদের আর্তচিৎকার কি এরা শুনতে পায় না? বিশ্বের তাবৎ শিয়ারা সিরিয়া-ইরাকে সুন্নী-মুসলিমদের নিধনের জন্যে জোটবদ্ধ হওয়ার পরও কি তারা ইরানের পক্ষ নিবে?

চার. আমেরিকার সিরিয়ায় ক্রুজ অ্যাটাকের পর কেউ কেউ মুসলিমদের সাথে পশ্চিমাদের সন্ধির হাদীসের বিষয়টি নিয়ে আসছেন। তবে এখনই এ ব্যাপারে কিছু বলা মুশকিল। অনাগত ভবিষ্যতের জন্যেই তা তোলা থাকলো।

এরদোগানের বিজয় নিয়ে বেশ উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বলি, ধীরে বন্ধু ধীরে..!

এখনো তুরস্ক ন্যাটোর অন্যতম সক্রিয় সদস্য! তুরস্কে আমেরিকার বিশাল ঘাঁটি এখনো বিদ্যমান। সিরিয়ার আলবাব, মানবিজে এখনো তুর্কী সেনাদের নির্মমতার চিহ্ন মুছে যায়নি। তারপরও আমরা কামনা করি, এরদোগান সঠিক পথে আসুক! হারানো খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রকৃত পথে তাকে উম্মাহ সাদরে গ্রহণ করবে। তবে, কুফফারদের পদলেহি নীতি, আর কুফরিতন্ত্রের জয়ধ্বনি দিয়ে মুসলিমদের সুলতান হওয়া যায় না!

আল্লাহ উম্মাহর এ ক্রান্তিলগ্নে যোগ্য রাহবার নসীব করুন, এ কামনাই করি।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

উস্তায মুগীরা সামেত

একদিন এক শিক্ষক তার ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা বড় হয়ে কী হবে? তখন একেক ছাত্র একেক রকম উত্তর দিল। কেউ বলল, আমি ডাক্তার হবো, কেউ বলল, আমি ইঞ্জিনিয়ার হবো, কেউ বলল, আমি পাইলট হবো। শুধু একটি ছেলে নীরবে বসে আছে, তাই তাকে নিয়ে অন্যরা হাসাহাসি করছে। তখন শিক্ষক তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কী হতে চাও? সে বলল, আমার আকাঙ্খা হলো আমি সাহাবী হতে চাই! তখন শিক্ষক আশ্চর্য হয়ে বললেন, তুমি সাহাবী হতে চাও কেন?

সে জবাবে বলল, আমার আম্মু প্রতি রাতে ঘুমানোর সময় আমাকে একজন সাহাবীর কাহিনী শোনান, তাই আমি সাহাবী হতে চাই। আমি জেনেছি, সাহাবীগণ বাহাদুর হোন, আল্লাহকে ভালোবাসেন, নবীজীকে ভালোবাসেন, তাঁরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেই ভয় পান না, তাই আমি তাঁদের মতো হতে চাই! তখন ওই শিক্ষক বুঝে ফেললেন, ওই ছেলেকে গড়ার পেছনে রয়েছেন একজন মহীয়সী মা। আজকাল ক'জন এমন মা পাওয়া যাবে?, যে তার সন্তানকে শৈশব থেকেই ইসলামি ধাঁচে গড়ে তোলে।

সর্বশ্রেষ্ঠ চারজন জান্নাতি নারী

উনাইসা আহ্‌সান বুশরা

আল্লাহ তাআলার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা; যাঁর অপার করুণায় আমরা আমাদের অন্তরে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সৌভাগ্য অর্জন করেছি। বিশ্বাস স্থাপন করেছি এমন প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি, যে সব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্যে তিনিই আমাদের আদেশ করেছেন। আমরা জানি, জান্নাত আর জাহান্নামই হচ্ছে চূড়ান্ত আবাসস্থল। প্রতিটি মানুষ এ দুই আবাসের কোনো একটিতে অবশ্যই প্রবেশ করবে। নিজের চূড়ান্ত আবাসস্থলের পানেই আমরা ছুটে চলছি। কেউবা বিশ্বাসের সাথে, আর কেউবা অবিশ্বাসের সাথে। দুনিয়াতেও মূলতঃ মানুষের মাঝে মূল বিভাজন দু'টিই; যদিও আমরা বিভিন্ন নামে অনেক বিভেদ প্রত্যক্ষ করছি। পবিত্র কুরআনে সূরা শুরা এর ৭নং আয়াতের শেষাশে আল্লাহ তাআলা এ দুই মূল বিভাজনকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন,

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

"একদল যাবে জান্নাতে আর একদল যাবে প্রজ্জ্বলিত আগুনে।" -সুরা শুরা:৭

আল্লাহ তাআলা আমাদের জান্নাতের পথে চলার সৌভাগ্য দান করুন। আমাদের মা-বোনদের উদ্দেশ্যে খুবই উত্তম একটি নাসিহা করেছিলেন শাইখ আনোয়ার আল আওলাকি রহ.। যেখানে তিনি আলোচনা করেছেন জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ চারজন মহীয়সী নারী সম্পর্কে। যাতে রয়েছে আমাদের জন্যে জান্নাতের পথে চলার পাথেয় লাভের উত্তম শিক্ষা।

"একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটা দাগ কেটে তাঁর সাহাবাগণকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো এগুলো কী? সাহাবায়ে কেরাম রাযি. উত্তর দিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সর্বশ্রেষ্ঠ চারজন জান্নাতি নারী হলো, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ, মার্‌ইয়াম বিনতে ইমরান, এবং আসিয়া বিনতে মুযাহিম (ফেরাউনের স্ত্রী)।"

আমরা যদি এই চারজন মহীয়সী নারীর জীবন পর্যালোচনা করি; তাহলে দেখতে পাই, তাঁদের মধ্যে রয়েছে দু'টি বিষয়ের অপূর্ব মিল।

প্রথমত: তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত মজবুত ঈমানের অধিকারী। তাঁদের ঈমান ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের। আর তা এমন দৃঢ় বিশ্বাস, যাতে কোনোভাবেই চিড় ধরানো যায় না। যে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস আছে; সে অন্তর চোখের দেখা, কানের শোনাকে উপেক্ষা করে তাঁর বিশ্বাসকেই প্রাধান্য দেয়। তাঁদের সকলের ঈমান যে ইয়াকীনের পর্যায়ে ছিল, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

এক. ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া আ. এর উদাহরণ ধরুন। একজন মহিলা পৃথিবীতে যা চাইতে পারে, তার সবই তাঁর ছিল। ছিল আরামদায়ক জীবন, ধন সম্পদ, ধনী ও প্রভাবশালী স্বামী, ক্ষমতা, দাসদাসী ও খাদেম-খাদেমা। কিন্তু ঈমানের স্বার্থে, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তিনি এর সবকিছুই পরিত্যাগ করতে রাজি ছিলেন। তিনি বাস করতেন সে সময়ের সর্বোৎকৃষ্ট রাজপ্রাসাদে; কিন্তু তারপরও তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন,

رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِين

"হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্যে আপনার কাছে জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করুন এবং ফেরাউন ও তার কর্ম হতে মুক্তি দিন। আর আমাকে মুক্তি দিন জালেম সম্প্রদায় হতে।" -সূরা তাহরীম:- ১১

আমাদের বুঝতে হবে আসিয়া আ. এমন এক বিষাক্ত পরিবেশে ছিলেন, যা সব দিক থেকেই ঈমানের পরিপন্থী ছিল। তাঁর বসবাস ছিল আল্লাহর শত্রুদের সাথেই; কিন্তু কুফরিশক্তিকে উপেক্ষা করে নিজেকে আল্লাহর পথে অটুট রেখে তিনি ঈমানের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। [অবশ্য এ বিষয়টা জেনে নেওয়া জরুরী, তখনকার যুগে কাফের স্বামীর সাথে বিবাহ এবং ঘর-সংসার করা জায়েয ছিল; তবে আমাদের শরীয়তে এটা জায়েয নেই। এখন কোনো মুসলিম নারীর স্বামী কাফের হয়ে গেলে, তার সাথে বিবাহ ভেঙ্গে যাবে।]

আমরা অপর তিনজনের জীবন পর্যালোচনা করলেও একই রকম দৃঢ় ঈমানের দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

দ্বিতীয়ত: তাঁদের মধ্যে যে ব্যাপারটির সাধারণ মিল ছিল তা হলো, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মা অথবা স্ত্রী। এখন এই ব্যাপারে নারীবাদীদের এবং আমাদের সে সব বোনদের; যারা নারীবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত, তাদের আপত্তি থাকতে পারে। মার্‌ইয়াম আ. এর কোলে বড় হয়েছিল ঈসা আ. আর আসিয়া আ. এর কোলে বড় হয়েছিল মূসা আ.।

দুই. খাদীজা রাযি. হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। কী ছিল সেই কারণ? যার ফলে, তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ নারীদের একজন বলা হয়েছে? এটা কি তাঁর ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্যে? নাকি তাঁর জ্ঞানের জন্যে? আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার, ঠিক কী কারণে তাঁকে এই উপাধি দেয়া হয়েছে? বিশেষ করে, আমাদের বোনদের এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। খাদীজা রাযি. কে আল্লাহ এত মর্যাদা দিয়েছেন; তা কিন্তু এই জন্যে নয় যে, তিনি অনেক সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। বরং তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসাধারণ এক সহধর্মিণী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনি প্রয়োজন, তখনি তিনি পাশে পেয়েছিলেন খাদীজা রাযি. কে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুয়তের শুরুতে সবচেয়ে নাজুক পরিস্থিতিতে অবিচল সাহস আর প্রেরণা যুগিয়েছেন এই মহীয়সী নারী খাদীজা রাযি.।

তিন. আর ফাতিমা রাযি. ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সবচেয়ে ছোট ও আদরের কন্যা এবং আমিরুল মু'মিনীন আলী রাযি. এর সহধর্মিণী। আলী রাযি. অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন। ঘরের কাজ করতে ফাতিমা রাযি. কে অনেক বেগ পেতে হতো। আটা পিষতে পিষতে তাঁর কোমল হাতে কঠিন ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। অথচ তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল এবং তৎকালীন মদিনা ইসলামি রাষ্ট্রের কর্ণধারের অতি আদরের কন্যা।

একবার তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে একজন কাজের লোক চাইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের জবাবে বললেন, আমি তোমাদের এর চেয়েও উত্তম কিছু শিখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা শোয়ার আগে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আক্‌বার বলবে।

ফাতেমা রাযি. কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি বলেছিলেন, ফাতিমা আমার একটি টুকরো। সে যাতে খুশি হয়, আমিও তাতে খুশি হই। সে যাতে কষ্ট পায়, আমিও তাতে কষ্ট পাই। ফাতিমা রাযি. দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছিলেন। আর জান্নাতের নারীদের কর্ণধারও হবেন তিনিই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাতের আগ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন তাঁর একমাত্র জীবিত সন্তান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইলে ফাতিমা রাযি. কে একজন কেন, দশজন খাদেমও দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা না করে ফাতিমাকে উপদেশ দিলেন, ঘরের কাজ নিজের হাতে চালিয়ে যেতে। আর এই কারণেই ফাতিমা রাযি. চারজন সর্বশ্রেষ্ঠ নারীদের একজন।

চার. জ্ঞানের দিক থেকে আয়িশা রাযি. ছিলেন খাদীজা রাযি. ও ফাতিমা রাযি. এর ওপরে; কিন্তু মর্যাদার দিক থেকে উনি খাদীজা রাযি. ও ফাতিমা রাযি. এর সমকক্ষ ছিলেন না।

আমাদের বোনেরা! আপনারা যখন আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করবেন, তখন আপনাদের কীসের ওপর বেশি প্রাধান্য দেয়া দরকার তা ঠিক করে নিবেন। তথাকথিত নারীবাদীরা জাগতিক ব্যাপারে আপনাদের কিছুটা সাহায্য করলেও আখিরাতে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আপনারা এ শাস্তি থেকে রক্ষা পাবেন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে। আমরা এ কথা বলছি না যে, আপনারা জ্ঞান অর্জন করবেন না বা ইসলামের কাজ করবেন না; কিন্তু আপনাদের সব সময় মাথায় রাখা দরকার, কীসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাদের সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন।

হে বোন! আসুন, আমরা আমাদের মর্যাদার পথ ধরেই জান্নাতে চির শান্তির আবাস গড়ি। আল্লাহ তাআলা আমাদের হিদায়াতের আলোতে আলোকিত করুন। আমীন!
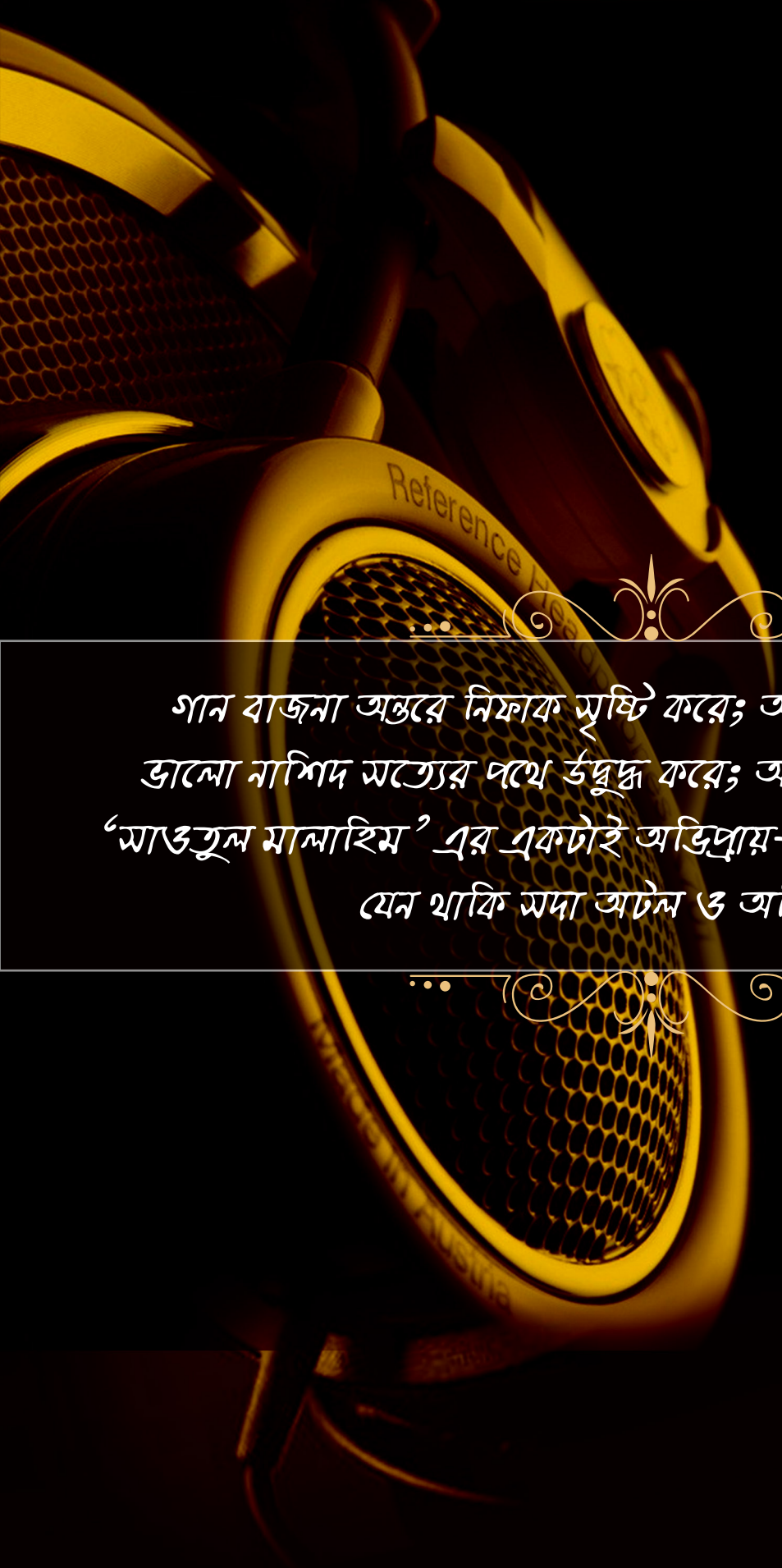
গান বাজনা অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে; আত্মাকে করে কলুষিত।
ভালো নাশিদ সত্যের পথে উদ্বুদ্ধ করে; অন্তরাত্মা রাখে উজ্জীবিত।
'সাওতুল মালাহিম' এর একটাই অভিপ্রায়— দ্বীন বিজয়ের পথে আমরা
যেন থাকি সদা অটল ও অবিচলতায়।

صوت الملاحم

SAWTUL MALAHIM